খাঁচা ছাড়া

তারাপদ রায়

মিত্র ও ঘোষ পাব্লিশার্স
প্রাইভেট লিমিটেড
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

প্রথম প্রকাশ, ১লা বৈশাখ ১৩৪৯

অঙ্কন : গৌতম রায়
মুদ্রণ : নিউ ইণ্ডিয়া প্রেসেস

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩ হইতে শ্রী এস. এন রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও মানসী প্রেস, ৭৩ মাণিকতলা স্ট্রীট, কলিকাতা ৬ হইতে প্রদীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত

শ্রীযুক্ত শঙ্খ ঘোষের করকমলে

সূচীপত্র

খাঁচাছাড়া ৭ / কুমুদিনী ৬৭

খাঁচা ছাড়া

॥ এক ॥

উপক্রমণিকা

I am thy father's spirit,
Doom'd for a certain time to walk the night,'

Shakespeare, Hamlet.

এ আমার স্বপ্নাদ্য কাহিনী।

এ কাহিনী আনন্দের না বেদনার, সুখের না দুঃখের, জীবিতের অথবা মৃতের —তা আমি নিজেও জানি না।

এই আখ্যানের রাস্তাঘাট, মানুষজন, সাল-তারিখ কিছু ঠিক, কিছু বেঠিক। তা নিয়ে আমার চিন্তা নেই। আর এই ইহলোকেব যাঁরা, ঐ পরলোকের যাঁরা নিজ গুণে, বিনা প্রবোচনায় আমার এই স্বপ্নের মধ্যে ঢুকে গেছেন তাঁরা নিশ্চয় নিজগুণেই আমাকে মার্জনা করবেন।

এ কাহিনী কোনো এক ভট্টাচার্য বংশের দুই যুগের দুই অবিচ্ছেদ্য আত্মারামকে নিয়ে, একজন এই বংশের দ্বিতীয় প্রজন্ম, অন্যজন একই ডায়নাস্টির শেষ পুরুষ।

প্রথম আত্মারাম তথা হারু তথা কাকাবাবুব মৃত্যু অথবা জন্ম হয়েছিল উনত্রিশে জুলাই, উনিশশো এগারোয় যেদিন মোহনবাগান ক্লাব আই এফ এ পেলো—সে বহুকাল আগের কথা; দ্বিতীয় আত্মারাম, আমাদের খুব কাছের, ধরাছোঁয়ার মধ্যে। এক অসফল, উদ্যোগহীন ব্যক্তি, হলেও-বা-হতে-পারতো কবি, এই পরের আত্মারাম—তাকে নিয়েই আমাদের যত গল্প।

একজন বাঙালী ভদ্রলোকের পক্ষে আত্মারাম নামটা নিয়েই বসবাস করা কঠিন। তার সঙ্গে ভট্টচার্য, পুরো নাম আত্মারাম ভট্টাচার্য। যেন ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে জলজ্যান্ত উঠে এসেছে, বর্গীর হাঙ্গামায় ভিটে-মাটি ছেড়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে।

পদবীটার দায়িত্ব অবশ্যই আত্মারামের পিতৃ পুরুষদের কিন্তু আসল নামটা আত্মারামের মাতামহের দেয়া। আত্মারাম জন্মেছিলো গয়াতে তার মামার বাড়িতে। গয়া মিউনিসিপ্যালিটির দোর্দণ্ডপ্রতাপ চেয়ারম্যান তখন রায়সাহেব আত্মারাম চৌধুরী, তিনি ছিলেন আমাদের বর্তমান আত্মারামের মাতামহের প্রধান বন্ধু। সেই প্রাতঃস্মরণীয় চৌধুরী সাহেবের নামেই আত্মারামের নামকরণ হয়েছিলো, বিনিময়ে রায়সাহেব একটি সতেরো আনি সোনার আশরফি দিয়ে বন্ধুর দৌহিত্র এই আত্মারামের মুখদর্শন করেছিলেন।

এই নামের জন্যেই অনেকটা এবং আরো কিছু কিছু নৈসর্গিক ও অনৈসর্গিক কারণে আত্মারাম ভট্টাচার্যের এখন পর্যন্ত বিয়ে থা, চাকরিবাকরি বিশেষ কিছুই হয় নি। তার বয়সে এখন ত্রিশের ওপাশে। কয়েকটি অপোগণ্ড ছাত্রের প্রাইভেট টিউশনি করে কালীঘাটের এক প্রাচীন ভাঙা দোতলা পৈতৃক ভিটেয় শূন্যগৃহে তার দিন কাটে।

বহু কালের জরাজীর্ণ বাড়ির দেয়ালের পলেস্তারা খসে গত শতকের ছোট ছোট আকারের লাল বাংলা ইট বেরিয়ে পড়েছে। শতাধিক বৎসরের পুরনো বাড়িতে এখন সব কিছুই প্রায় ভেঙ্গে-ধসে নিচতলায় একটা ঘরে এসে ঠেকেছে আর ভাঙা সিঁড়ির মাথায় সিঁড়িকোঠা বা চিলেকোঠা ঘর কোনো অজ্ঞাত কারণে এখনো টিকে আছে।

এই একতলার ঘরের এক পাশে একটা জনতা কেরোসিন স্টোভে আত্মারাম রান্নাবান্না করে। ঘরের অন্যপাশে রয়েছে একটা বিশাল কালো তিন হাত উঁচু মেহগনি কাঠেব খাট, দুটো সিঁড়ির ধাপ খাটের সঙ্গে করা আছে, সেটা বেয়ে উঠতে হয়। খাটটা আত্মারামের পিতামহী বিবাহের সময় পিত্রালয় থেকে নিয়ে এসেছিলেন। সেই খাটের বাজুতে চমৎকার পদ্ম, গোলাপ আর গোলাপের পাতা, কাঠের খোদাইয়ের কাজ, কবেকার কিন্তু মনে হয় যেন ফুলগুলো তাজা, টাটকা সদ্য ফুটে উঠলো, এই এঁদো অন্ধকার ঘর আলো করে।

কোনো রকমে আত্মারামের দিন যায়। সে মানুষটি ভালো। ভালো থাকা কি ব্যাপার, ভালো আছি না খারাপ আছি এসব নিয়ে কোনো

দুঃখ ছিলো না আত্মারামের। নিজের অবস্থার সঙ্গে সে যথেষ্টই মানিয়ে নিয়েছিলো।

কিন্তু আজ কিছুদিন হলো সে পড়েছে একটা অদ্ভুত ঝামেলায়। তার ঠাকুর্দার এক কাকা সেই উনিশশো এগারো সালে মারা যান। তখন সেই কাকার বয়েস মাত্র উনিশ। সেদিন মোহনবাগান আই এফ এ শিল্ড জিতেছে, সারাদিন লাফালাফি, দৌড়োদৌড়ি করে কাকাবাবু বাড়ি ফিরে এসেছেন, তখন তাঁর পেটে নাড়িছেঁড়া খিদে। কাকাবাবু ফিরে এসেই খেতে বসেছেন, উত্তেজনায় তাড়াতাড়ি মুখে আলুসেদ্ধ-ভাত হঠাৎ গলায় আটকে গেলো, তারপর কিসে কি হলো বলা কঠিন কিন্তু ক্ষুধার্ত কাকাবাবু কপালে দুচোখ তুলে রান্নাঘরের পিঁড়ির উপরেই ভিরমি খেয়ে পড়ে সঙ্গে সঙ্গে ভবলীলা সাঙ্গ করলেন।

তখন থেকে এ বাড়িতে আলুসেদ্ধ-ভাত খাওয়া নিষিদ্ধ। আর সেই যে খালি পেটে চোঁচোঁ খিদে নিয়ে কাকাবাবু ভরসন্ধ্যেয় অপঘাতে মারা গেলেন তাঁর কিন্তু সরাসরি পরলোক যাওয়া হলো না, ক্ষুধার্ত অশরীরী কাকাবাবু ঐ বাড়ির মধ্যেই রয়ে গেলেন। কাকাবাবু যদি বিখ্যাত ব্যক্তি হতেন তবে এতদিনে তাঁর মৃত্যুর প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী করার সময় এসে গেছে প্রায়, কিন্তু কাকাবাবুর খিদে আজও মেটে নি; বাড়ির মধ্যেই ছায়ায় ছায়ায় ঘুরে বেড়ান।

ভট্টাচার্য বাড়ির উঠোনে আগে একটা বেল গাছ ছিলো, কাকাবাবু সেখানেই বসবাস করতেন। কিন্তু বছর চল্লিশ আগে এক কালবোশেখিতে বেল গাছটা পড়ে যায় তারপর থেকে কাকাবাবু নিজের বাড়ির ভাঙা চিলেকোঠার এক প্রান্তে কয়েকটা চামচিকের সঙ্গে ভাগাভাগি করে থাকেন। এটা অবশ্য শুধু দিনের বেলাটুকুর জন্যে, রাতে যখন চামচিকেরা বেরিয়ে পড়ে তিনিও বেরিয়ে পড়েন একই সঙ্গে, বেশি দূর যান না, বাড়ির মধ্যেই থাকেন।

অনেক কাল আগে ভূত হওয়ার প্রথম প্রথম কাকাবাবুকে কেউ কেউ অল্পবিস্তর ভয় পায় নি তা নয়, যত নিকট আত্মীয়ই হোক হাজার হোক ভূত তো! কিন্তু ক্রমে ক্রমে এই সত্তর বছরে আত্মারামদের বাড়ির

লোকদের কাকাবাবুর ভৌতিকতা গা-সহা হয়ে গেছে। পুরুষানুক্রমে ব্যাপারটার সঙ্গে তাঁরা মানিয়ে নিয়েছেন। কাকাবাবু যখন প্রথম ভূত হলেন তখনও কাকাবাবুর মা বেঁচে, তিনি যখন বুঝতে পারলেন ছেলে মরে গিয়েও কোথাও যায় নি বাড়িতেই আছে, সন্ধ্যা হলেই রান্নঘরের আনাচে-কানাচে ঘুর ঘুর করছে পেট ভরা খিদে নিয়ে, তিনি ভূত ছেলেটাকে কখনো একটু দুধের সর, কখনো এক টুকরো মাছ ভাজা খেতে দিতেন। একটা ছোট বাটিতে করে বেল গাছটার নিচে রেখে আসতেন, রাতে কোনএক সময়ে সুযোগ মত কাকাবাবু সেটা খেয়ে নিতেন। কিন্তু শরীর তো নেই তাঁর তাই খাওয়ার যতটা লোভ তার এক চিলতেও ক্ষমতা নেই।

সে যা হোক কাকাবাবুর মায়ের এই ভূত-ছেলেকে লুকিয়ে লুকিয়ে খাওয়ানোর ব্যাপারটা সবাই বুঝে ফেলল কিন্তু স্নেহ কিংবা মায়াবশত কেউ কিছু বললো না। বরং কাকাবাবু, যাঁর ডাকনাম ছিলো হারু, শেষপর্যন্ত ভালোমন্দ খাওয়ার একজন বাঁধা ভাগীদার হয়ে গেলেন। ভাদ্রমাস, তালের বড়া ভাজা হচ্ছে, সকলেরই কিন্তু খেয়াল আছে, 'এই হারুকে দুটো তালের বড়া দিস।' কিংবা বড়মামা কৃষ্ণনগর থেকে সর-ভাজা এনেছেন, সবাই মনে করে বেলতলায় হারুর জন্যে রাখা বাটিতেও এক টুকরো সরভাজা দিয়ে দিতো।

এইরকম চলেছে অনেকদিন। পাড়াপ্রতিবেশীরাও জেনে গেলো। কাছাকাছি কোনো বাড়িতে বেড়ালে মাছ দুধ চুরি করে খেলে পর্যন্ত সকলে বলতো, 'হারু খেয়ে গেছে·।'

কাকাবাবু কিন্তু কখনোই নিজের ভিটে ছেড়ে যান নি, এই গত তিয়াত্তর বছরে একদিনের জন্যেও যান নি। একবার বছর ষাটেক আগে কি কারণে যেন, আরেকবার দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে এ বাড়ির সবাই সদর দরজায় তালা দিয়ে কলকাতা ছাড়া হয়েছিলো, তখন কাকাবাবু ছিলেন এই বাড়িতেই। কাকাবাবুর তখন খাওয়া জুটতো না কিন্তু শরীর নেই তাই খিদে আছে কিন্তু খিদের কষ্ট নেই, লোভ আছে কিন্তু লোভের নিবৃত্তি নেই, খাওয়ার জন্যে খুব মন হুহু করে উঠলে দুটো বেল-

পাতা চিবোতেন। বেলপাতার গন্ধ বড় সাত্ত্বিক ; ভূতেদের তেমন পছন্দ নয়, তবু কাকাবাবু সেই দুর্দিনে কষ্টে সৃষ্টে বেলপাতা চিবিয়েই কাটিয়ে দিতেন। হাজার হোক মানুষ্যজন্মে তো ব্রাহ্মণ সন্তান ছিলেন, বেলপাতায় অন্যান্য প্রেতেদের যত কষ্ট হয়, তাঁর তা হতো না।

সকাল-সন্ধ্যা প্রাইভেট টিউশনি করে আত্মারামের চলে যায়। একা মানুষ, কখনো ডিমসেদ্ধ-ভাত, কখনো মোড়ের মাথা থেকে আলুরদম-রুটি কিনে আনে। সকালে মোড়েব চায়ের দোকানের চা, বিস্কুট কখনো ছাত্রছাত্রীর বাড়ীতে সামান্য জলখাবার কোনোরকমে নিজের আহার হয়ে যায় আত্মারামের।

কিন্তু অসুবিধা হয়েছে ঐ কাকাবাবুটিকে নিয়ে। ভট্টাচার্য বাড়িতে এখন আর কেউ নেই, কাকাবাবুর পুবো দায়িত্ব এখন এসে পড়েছে আত্মারামেব উপর। আত্মারামের তাতে আপত্তি নেই। সম্পর্ক তো আর তেমন ফেলনা নয়, ভূত হোক, মানুষ হোক, ইচ্ছে করলেই কি দায়িত্ব এড়ানো যাবে। লোকে ছি ছি করবে, ভূতেরাও জানতে পারলে ছি ছি করবে, আপন ঠাকুর্দার আপন কাকা, সাধুভাষায় যাকে বলে খুল্ল-প্রপিতামহ, মহাভারতেব ভীষ্মদেব অভিমন্যুর যা হতেন ঠিক তাই।

ফেলার সম্পর্ক তো নয়। আর তাছাড়া এই ভট্টাচার্য বাড়ির এক অংশ তো কাকাবাবুর, তা নিয়ে তো তিনি কোনদিনই কিছু আত্মারামেব কাছে দাবি করেন না। এমন কি আত্মারামের জন্যে ভাল ঘরটা ছেড়ে দিয়ে নিজে ভাঙ্গা চিলেকোঠায় চামচিকের মধ্যে কষ্ট করে থাকেন। এত সব বিচার বিবেচনা করে তারপর কাকাবাবুর দায়িত্ব কি করে অস্বীকার করবে আত্মারাম ?

আত্মারাম বহু বিবেচনা করে দেখেছে। এই পুরনো ভট্টাচার্য বংশে এখন তারা মাত্র দুজন, সে আর কাকাবাবু। কাকাবাবুকে সে ফেলতে পারবে না আবার এই বাড়ির অংশও তো কাকাবাবুরও নিশ্চয় অর্ধেক পরিমাণ। কোনো উকিলের সঙ্গে পরামর্শ করতে গেলে তিনি হয়তো হেসে উড়িয়ে দেবেন। আর কাকাবাবু নিজে তো কোনোরকম আলাপ আলোচনার ঊর্ধ্বে।

এই পুরনো ভাঙ্গা বাড়িতে আত্মারাম আর থাকবে না। বেচে-টেচে কোথাও চলে যাবে। কিন্তু কাকাবাবুর অনুমতি দরকার। তিনি কি তা দেবেন, দিতে পারবেন। আর কাকাবাবু যদি তার সঙ্গে যেতে চান, আত্মারাম নিশ্চয়ই তাঁকে সঙ্গে নিয়ে যাবে। তা সে যেখানেই যাক। এককালের প্রাচীন পূর্বপুরুষ, সাবেকি ভট্টাচার্য বংশের যে রক্ত আত্মারামের ধমনীতে বইছে, কাকাবাবুর ধমনীতেও সেই একই রক্তধারা বহমান।

এই রকম ভাবতে ভাবতে আত্মারামের খটকা লাগে, কাকাবাবু তো আর মানুষ নয়, প্রেতাত্মার আবার ধমনীই বা কি, রক্তই বা কি?

মেহগনি খাটের উপরে বহুকাল লাট হয়ে যাওয়া শতচ্ছিন্ন গদিতে একটা ময়লা তেলচিটে বালিশ মাথায় দিয়ে আকাশপাতাল ভাবে আত্মারাম। জনতা স্টোভের ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় কড়িকাঠ, বরগা কালো হয়ে গেছে, ভিতরের ছাদের পলেস্তারা খসে গিয়ে লম্বা টালিগুলো বেরিয়ে পড়েছে। আর কতদিন থাকা যাবে এই বাড়িতে, কে সারাবে? তার চেয়ে বেচেবুচে বেরিয়ে পড়া ভালো। আবার কাকাবাবুর কথা আসে, কাকাবাবুকে ফেলে তো যাওয়া যাবে না।

ঠিক এই সময়ে ভাবনার এই মুহূর্তে আত্মরামের প্রত্যেকবারই মনোরমার কথা মনে পড়ে। কিন্তু মনোরমা, সে আজ কোথায়?

বাইরে ঝুপ ঝুপ করে বৃষ্টি নেমেছে। আজ কয়েকদিন হলো খুব বৃষ্টি হচ্ছে। একটু বৃষ্টি বেশি হলেই, ঝিরিঝিরির মাত্রা ছাড়িয়ে গেলেই, আত্মারামের ফাটা ছাদ দিয়ে জল পড়ে। এতদিন দেয়াল চুঁইয়ে জলটা পড়তো, কিন্তু কালকে রাতে সরাসরি খাটটার উপরে জল পড়েছে। এখনো গদিটা স্যাঁতসঁাতে ভিজে রয়েছে। গদিটাকে সে উল্টে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলো, কিন্তু ভারি গদি একা ওলটানো কঠিন। তাছাড়া ওলটাতে গিয়ে ভয় হলো, হয়তো একেবারেই ফেঁসে যাবে। একশো বছর আগের কোনো এক শিমুল গাছের তুলো বন্দীদশা থেকে মুক্তি পেয়ে হাওয়ায় ছড়িয়ে পড়বে।

খাটটা টানাটানি করা আরো কঠিন, অসম্ভব। আর এইটুকু ঘরে

অতো জায়গাই বা কোথায়। তবে সোজাবুদ্ধির কোনদিনই অভাব হয়নি আত্মারামের, সে ঠিক করেছে আজো যদি ছাদ দিয়ে জল পড়ে সে চাদর বালিশ নিয়ে খাটের নিচে শোবে। খাট আর গদিটা তাঁবুর কাজ করবে। অবশ্য দু-চারটে আরশোলা বা নেংটি ইঁদুর বিরক্ত করতে পারে, তা করুক।

বাইরে বৃষ্টির শব্দ আরো ঘন হয়ে এসেছে। জোলো হাওয়া বৃষ্টির গুঁড়ো নিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকছে পুবের জানালাটা দিয়ে। কিছুক্ষণ ভালোই লাগছিলো, তারপর উঠে বন্ধ করতে গেলো জানালার পাল্লাদুটো। তখনই তার মনে হলো, নিশ্চয়ই কাকাবাবুর কোনো কষ্ট হয় না বৃষ্টিতে!

আর মনোরমা এই বৃষ্টির দিনে কোথায়, কোন্ বাড়িতে সে এখন কি করছে, কেমন আছে?

॥ দুই ॥

পুরনো সেই দিনের কথা

'Old, unhappy for off things,
and battles long ago.'

Wordsworth, The Solitary Reaper.

তারিখটা ছিলো উনত্রিশে জুলাই, উনিশশো এগারো সাল। খেলা শেষ হওয়ার মাত্র দশ মিনিট বাকি। রুদ্ধশ্বাস সমান সমান খেলা চলছে, সাহেব আর বাঙালীর জীবনপণ খেলা। তখন আর মাত্র দশ মিনিট বাকি, গ্যালারি স্তব্ধ হয়ে গেলো, হাজার হাজার দর্শকের চীৎকার, উত্তেজনা মুহূর্তে ম্লান হয়ে গেলো; শুধু কিছু গোরা আর ট্যাঁশ সাহেব উদ্দাম লাফাতে লাগলো, নেটিভদের থোঁতা মুখ ভোঁতা হয়েছে, অকল্পনীয় ফ্রি-কিকে ইয়র্কশায়ার এক গোলে এগিয়ে গেলো।

র‍্যামপার্টে দাঁড়িয়ে খেলা দেখছিলেন কাকাবাবু, যাঁর ডাক নাম হারু, ভালো নাম হারুপদ ভট্টাচার্য। কালীঘাটের বাড়ি থেকে কোনো রকমে

কাঁচা লঙ্কা তেল দিয়ে ডাল ভাত মেখে গলাধঃকরণ করে সাড়ে দশটার সময় বেরিয়ে পড়েছেন। বাড়িতে রান্না হতে হতে প্রতিদিন বেলা দেড়টা-দুটো হয়ে যায়। জোরাজুরি করে মাকে দিয়ে চারটি ডাল ভাত সেদ্ধ করিয়ে খেয়ে আসতে পেরেছে। বাড়িতে উনুন ধরে না বেলা দশটার আগে, মা আলাদা করে তোলা উনুনে রান্না করে দিয়েছেন।

মায়ের একটু বেশি দুর্বলতা আছে হারুর উপর, বড় রোগা ছেলে, তার উপরে কোলের ছেলে। হাড় জিরজিরে, কঙ্কালসার চেহারা পিলেভর্তি বেঢপ পেট, বছরের অর্ধেক সময় ম্যালেরিয়ায় ভুগে বিছানায় পড়ে থাকে। মা বার বার মানা করেছিলেন হারুকে, 'এতটা পথ, গড়ের মাঠ কি কাছে নাকি, তোর এই শরীরে এতটা হাঁটা সইবে না।'

হারু নিষেধ শোনে নি। বলেছিলো, 'পাড়ার সবাই তো যাচ্ছে। আমিও তাদের সঙ্গে যাবো। আর তা ছাড়া আমাদের নীলুকাকা খেলছে, ফাইন্যালে তাঁর খেলা দেখতে যাবো না।' মোহনবাগানের দুর্ধর্ষ খেলোয়াড় নীলমাধব ভট্টাচার্য কি এক দূর সম্পর্কের ভাই হতেন হারুর বাবার। শেষ পর্যন্ত মা আর বাধা দিতে পারলেন না।

এবছর প্রথমে যেমন বৃষ্টিবাদলা ছিলো না একেবারে খটখটে, আষাঢ় মাসের শেষ থেকে জোর বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে এখন শ্রাবণ প্রায় অর্ধেক হয়ে এলো তবু বৃষ্টির বিরাম নেই। মালকোঁচা দিয়ে ধুতি পরে, হাতে বুট জুতো নিয়ে, কালীঘাটের পোটোপাড়ার মধ্য দিয়ে শর্টকাট করে, ভবানীপুর দিয়ে, পোড়াবাজারের পিছন দিয়ে পাড়ার বন্ধুদের সঙ্গে হৈ হৈ করতে করতে বেলা বারোটার মধ্যে র‍্যামপার্টে জায়গা দখল করে দাঁড়িয়ে পড়লো হারু।

হারু যুবকটি রুগ্ন ও দুর্বল। চেতলা স্কুলে পড়তো, পর পর দুবার এণ্ট্রান্সে ফেল করেছে। এখন থেকে এণ্ট্রান্স পরীক্ষা আবার উঠে গেলো, নতুন পরীক্ষার নাম হয়েছে ম্যাট্রিকুলেশন, ছোট করে ম্যাট্রিক। ম্যাট্রিক আবার একটা পরীক্ষা নাকি, কোথায় এণ্ট্রান্স আর কোথায় ম্যাট্রিক, ম্যাট্রিকুলেশনের নাম দিয়েছেন পণ্ডিত মশায়েরা মাতৃকুলনাশন। এ পরীক্ষা পাশ করা আর না করা সমান, হারু ঠিক করেছে এণ্ট্রান্স

যখন হলোই না, ম্যাট্রিক দরকার নেই। ম্যাট্রিক পাশের কোনো মূল্যই থাকবে না। একেবারে খেলো ব্যাপার হবে।

হারুর বড়মামা আলিপুরের উকিল রামজীবন চট্টোপাধ্যায়ের মুহুরি। হারুর হাতের লেখা ভালো, সৎ বংশ তা ছাড়া বোকাও নয়। বড়মামা বলে রেখেছে রামজীবনবাবুকে। রামজীবনবাবুর বড় ছেলেও তাঁরই সেরেস্তায় বসেছে, পাঁচ সাত বছর ওকালতি করছে এরই মধ্যে বেশ পসার করে ফেলেছে বড়মামার উকিলবাবুর বড় ছেলে রামগতিবাবু। ঐ রামগতিবাবুর জন্যেই একটা বাচ্চা মুহুরি লাগবে, আশা করা যাচ্ছে কাজটা হয়ে যাবে হারুর। একদিন বড়মামার সঙ্গে গিয়ে রামজীবনবাবু আর রামগতিবাবুর সঙ্গে দেখা করে এসেছে হারু। পদ্মপুকুরের কাছে বিরাট বাড়ি। রামজীবনবাবু বলেছেন, 'মুহুরির কাজ করবে? একালের ছেলেরা তো এসব কাজ করতে চায় না। তাদের নাকি মানহানি হয়! এণ্ট্রান্সটা পাশ করতে পারলে বা মোক্তার হতে পারতে।'

অত উচ্চাশা হারুর নেই। রামগতিবাবু তাকে আশ্বাস দিয়েছেন, 'বর্ষাটা যাক, পুজোর পরে এসো। তোমাকে দিয়েই আমার চলে যাবে। দরকার পড়লে বাবার সেরেস্তায় তো চারপাঁচ জন পাকা লোক রয়েছেই।' তারপর একটু থেমে বলেছেন, 'তবে বাবার মুহুরিবাবুদের দিয়ে আমার চলছে না। এখন মক্কেলরা এত চালাক হয়েছে। বাবাকে এক পক্ষ নিলেই অন্য পক্ষ আমাকে মামলা দিতে আসে। ভাবে বুড়ো-কত্তা নিশ্চয়ই ছেলেকে মামলা ছেড়ে দিয়ে জিতিয়ে দেবে। বাবাকে তারা অবশ্য চেনে না। কিন্তু আমার আলাদা মুহুরি চাই। মনে হচ্ছে, একটু শিখিয়ে পড়িয়ে নিলে তোমাকে দিয়েই হবে। এর মধ্যে তুমি তোমার বড়মামার কাছে কাজটা বুঝে নিতে থাকো।'

এই মুহূর্তে অবশ্য এসব চিন্তা হারুর মাথায় নেই। প্রায় দু ক্রোশ পথ হেঁটে আসা, তারপর পাকা চার ঘণ্টা খালি পেটে দাঁড়িয়ে থাকা, শুধু দাঁড়িয়ে থাকা নয়, চেঁচানো, লাফানো অবশেষে এই খেলা শেষ হওয়ার দশ মিনিটও বাকি নেই একটা বল ঢুকে গেলো গোলের মধ্যে, গোল লাইনের উপরে হীরালাল মুখার্জি হাঁ করে স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে

আছেন। বাঁদিকের গোল পোস্টটার দিকে—হারু এখন আর কিছু ভাবতে পারছে না, এত বড় মর্মন্তুদ দুর্ঘটনা, এত বড় আশাভঙ্গের ঘটনা হারুর উনিশ বছরের জীবনে আর ঘটেনি।

হারু মাঠের মধ্যে একবার নীলুকাকার দিকে তাকালো। নীলমাধব ভট্টাচার্য তখন মাথা নিচু করে হতভম্ব স্থির দাঁড়িয়ে, অভিলাষ ঘোষ তাঁর পাশে গিয়ে কি একটা বললেন, তাতে যেন নীলুকাকার সম্বিৎ ফিরে এলো। দ্রুত পায়ে নিজের জায়গায় গিয়ে দাঁড়ালেন।

মোহনবাগান সেণ্টার করেছে। হালদার বাড়ির গদাইদা পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তাঁর সঙ্গেই হারু এসেছে। গদাইদার প্রবল উৎসাহ, কিন্তু এই মুহূর্তে নিতান্ত মনমরা, হারুকে বললেন. 'চল হারু, অনেকটা হাঁটতে হবে। আর দেখে কি হবে?'

ঠিক সেই মুহূর্তে অঘটন ঘটলো। ইস্ট ইয়র্কের গোলকিপার দানবের মতো চেহারা, যেমন লম্বা তেমনি চওড়া, হাতের পাঞ্জা দশটা লোকের সমান সে বোকার মত ফ্যালফ্যাল করে দেখছে শিবদাস ভাদুড়ি তাকে পরাজিত করে গোল শোধ করে দিয়েছে। র‍্যাম্পার্টের আর মাঠের অর্ধেক লোক যারা তখন নিরাশ হয়ে বাড়ি ফিরবার উদ্যোগ করছিলো, তারা পাগলের মত ছুটে এলো। হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠলো জনতা। কে যেন ভিড়ের মধ্যে একটা ট্যাঁশ সাহেবকে পেছন থেকে লাথি ঝাড়লো। অন্যদিকে একটা গোরা সার্জেণ্ট একটা ঘোড়া চালিয়ে দিলো একদল দর্শকের মধ্যে দিয়ে, বলা বাহুল্য সেই দর্শকেরা কেউই সাদা-চামড়া নয়।

গদাই হালদারের সঙ্গে হারুর আর ফেরা হলো না, কে ফিরবে এই রুদ্ধশ্বাস মুহূর্তে? দম বন্ধ, নাড়ি বন্ধ, হৃৎপিণ্ডের আন্দোলন বন্ধ পাঁচ মিনিট। পাঁচ মিনিটের বেশি কষ্ট দিলেন না শিবদাস ভাদুড়ি, ইস্ট ইয়র্কের সাহেবগুলোকে পাশ কাটিয়ে একটা দুর্দান্ত বল তুলে দিলেন কিম্বদন্তীর অভিলাষ ঘোষের পায়ে, দানব ক্রেসি কিছুই করতে পারলো না, যে দুই হাত দিয়ে সে বল ধরে সেই দুই হাত দিয়ে নিজের মাথা চাপড়ে গুম মেরে গেলো।

রেফারির বাঁশিতে শেষ হুইসল বাজলো। ততক্ষণে সমবেত জনতা উত্তেজনায় অধীর হয়ে উঠেছে। শেষ বাঁশি বাজতেই গদাই হালদার শূন্যে একটা সাড়ে তিন হাত লাফ দিয়ে পড়লেন, একদল অচেনা লোকের উপরে। তারাও তখন লাফাচ্ছে, কেউ কিছু মনে করলো না। মাথার উপরে দু হাত তুলে হাজার হাজার লোকের সঙ্গে হারুও লাফাতে লাগলো, নাচতে লাগলো।

বাড়ি ফেরার পথে পাড়ার আর বেপাড়ার ছেলেদের সঙ্গে আদিগঙ্গায় বিচুলি ঘাটে জামাকাপড় সুদ্ধ একটা ডুব দিলো হারু। একটু সাঁতার কাটলো। মধ্য শ্রাবণের জোয়ারে ও জলে ফুলে ফেঁপে রয়েছে আদিগঙ্গা। ওপারে চেতলার হাটের মাঝ-বরাবর জল ঢুকে গেছে। স্নানের পর ঘাটে ফিরে এসে হারু দেখে বুট জুতো জোড়া পাড়ের বেলগাছটার গুঁড়ির পাশে রেখে গিয়েছিলো, সেটা নেই। খুব বেশি পায়ে দেওয়া হয়নি, জুতোটা প্রায় নতুন বললেই চলে। এই তো গত পুজোর সময় ধর্মতলায় গিয়ে হার্পারের দোকান থেকে কেনা, দেড় টাকা দাম লেগেছিলো, এতো দামের জিনিসটা কে চুরি করলো?

অবশ্য জুতো হারানোয় হারুর কোনো অসুবিধা হলো তা নয়। কারণ শুধু জুতো পরা কেন, জামা কাপড় সব কিছু থেকে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে অব্যাহতি পেলো হারু। বাড়ি ফিরে উত্তেজিত, ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত হারু ম্যালেরিয়া-ভোগী দুর্বল যুবকটি সারাদিনের পরিশ্রম আর উত্তেজনার ধকল কাটিয়ে উঠতে পারলো না। প্রথম ভাতের গ্রাসটা মুখে দিয়েই কি রকম দম বন্ধ মনে হলো তার, আলু সেদ্ধ দিয়ে টান টান করে মাখা ভাতের প্রথম দলাটাই গলায় আটকে গেল নাকি বুকের ভেতর থেকে একটা প্রচণ্ড ধাক্কা উঠে এলো, কিছু বুঝে ওঠার আগে কপালে চোখ তুলে ধরাশায়ী হলো হারু। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে সব শেষ।

সব শেষ অথবা সব শুরু।

হারুর সব শেষ হলো, শুরু হলো কাকাবাবুর।

হারু নামে সদ্য কৈশোর অতিক্রান্ত অকালমৃত যে যুবকের কথা

আমরা এতক্ষণ বললাম, মাত্র উনিশ বছর বয়েসে আনন্দ ও পরিশ্রমের আতিশয্যে যে দেহত্যাগ করেছিলো, সঙ্গত কারণেই তাকে আমরা আপনি আজ্ঞে করিনি।

কিন্তু আজ এই উনিশশো চুরাশি সালে হারুর অশরীরী অস্তিত্বের বয়েস তিয়াত্তর পার হয়ে চুয়াত্তরে এসে পড়েছে। যদিও উনিশ বছরের যুবকের আত্মা সে, কিন্তু তার প্রবীণতা স্মরণ করে এই কাহিনীতে তাকে কাকাবাবু হিসেবে আপনি বলে সম্বোধন করবো, তবে হারুকে তুমিই বলবো।

সেটাই উচিত হবে। তা ছাড়া হারু নামে এণ্ট্রান্স ফেল, খেলা-পাগল যুবকটিকে যাঁরা চিনতেন তাঁরা বহুকাল বিগত হয়েছেন। কাকাবাবু বেঁচে থাকলে এখন তাঁর বয়েস হতো নব্বয়ের কোঠায়। উনিশশো ষাট সালে পাশের বাড়ির গদাই হালদার, তার পরে সাতষট্টি সালে কাকাবাবুর এক ভাগিনেয়, যার হারুর মৃত্যুকালে বয়েস ছিলো সাত-আট বছর, এরা দুজন মারা যাওয়ার পর মর-পৃথিবীতে কাকাবাবুকে স্মরণ করতে পারে এমন কেউ রইলো না।

ফলে এখনকার ভট্টাচার্য বাড়ির আশেপাশের লোকেদের কাকাবাবু সম্পর্কে কোনো প্রত্যক্ষ ধারণা নেই। তবে সবাই মোটামুটি জানে যে ভট্টাচার্য বাড়িতে একটা বহু পুরনো ভূত আছে। আগে কাকাবাবু ছোটখাটো গোলমাল করতেন, কিন্তু একালের মানুষদের তাদের কথাবার্তা চালচলন, আচার-আচরণ কাকাবাবুর কাছে কেমন গোলমেলে লাগে, তিনি তাদের যথাসাধ্য এড়িয়ে চলেন।

চিরকাল এরকম ছিলো না। প্রথম-প্রথম সন্ধ্যার আড়ালে কাকাবাবু একটু মজা করতেন। সেই তিয়াত্তর বছর আগে কাকাবাবুর দু চারজন বন্ধুবান্ধব এ পাড়ার কয়েকজন বখা যুবক কালীঘাট মন্দিরের চাতালে বসে দল বেঁধে গাঁজা খেতো। কখনো কখনো সন্ধ্যাবেলা কাকাবাবু তাদের পাশে গিয়ে বসতেন। হাতে হাতে গাঁজার কলকে ঘুরছে হঠাৎ কাকাবাবু দুজনের মধ্যে অদৃশ্য হাত বাড়িয়ে কলকেটা ধরে নিলেন। গাঁজার নেশায় সবাই বুঁদ, এই আচ্ছন্ন অবস্থায় প্রথমে কেউ টের

পেতো না কিন্তু একটু পরে গোলমাল লাগতো, হাতে হাতে গাঁজার কলকেটা তো আর ঘুরছে না, কলকেটা গেলো কোথায় ? হঠাৎ নেশার চোখে কাকাবাবুর চেতলা স্কুলের ক্লাস ফ্রেণ্ড শিবকালী, তখন সে ইস্কুল ছেড়ে চেতলা হাটে মশারির দোকান করেছে, সে দেখে একটু দূরে শূন্যে অন্ধকারে উত্তরের অশ্বত্থ গাছটার বাঁয়ে জ্বলন্ত কলকেটা উড়ছে আর তার মধ্য থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। শিবকালী সে দিকে তাকিয়ে দেখতেই কে যেন শূন্য থেকে কলকেটা আছড়ে ফেললো গাঁজাখোরদের চক্রের মধ্যখানে, ছোট মাটির কলকে মট করে ভেঙে গেলো।

কে ভাঙলো কলকেটা, এই নিয়ে একে অন্যকে দোষারোপ করে প্রায় হাতাহাতি করতে যাচ্ছে, তখন শিবকালী দাঁড়িয়ে হাত তুলে সবাইকে বললো, 'আরে, আমরা কেউ কলকেটা ফেলিনি, এটা হারুর কাণ্ড। একে শনিবারের সন্ধ্যে, তারপরে বিকেলে চতুর্দশী লেগেছে। যে যার মত বাড়ি ফিরে যা।'

কালীঘাট থেকে কেওড়াতলা পর্যন্ত আদিগঙ্গার পূর্বপারের পাড়াটায় সে আমলে হারুর মত আরো কেউ কেউ ছিলো। সাধারণত হঠাৎ বা অপঘাতে মৃত্যু হলে বছর খানেক হাওয়ায় হাওয়ায় পাড়াব মধ্যে ঘোরাঘুরি করে বাৎসরিক শ্রাদ্ধ মিটে যেতে তারাও মিলিয়ে যেতো।

কিন্তু কোথায় যেন কি একটা গোলমাল হয়েছিলো হারু অর্থাৎ কাকাবাবুর ক্ষেত্রে। ঐ গাঁজার কলকের ঘটনা ঘটেছিলো তাঁর মৃত্যুর বেশ কয়েক মাস পরে। ততদিনে বাড়ির লোকেরা, পাড়ার লোকেরা জেনে গেছে হারু যায় নি, হারু রয়ে গেছে।

শিবকালী একদিন সকাল বেলায় ভট্টাচার্য বাড়িতে গিয়ে হারুর বড়দা চারুবাবু, মানে আত্মারামের প্রপিতামহের সঙ্গে দেখা করে অনেক কথা বলেছিলো। হারুর সহপাঠী হিসেবে সেও হারুর বড়দাকে বড়দা বলতো, বললো, 'বড়দা, হারু তো এখনো ঘোরাঘুরি করছে। বামুনের ছেলে, লোকে নিন্দে করছে, বলছে ব্রহ্মদত্যি উৎপাত করছে। আপনারা আরেকবার ওর শ্রাদ্ধশান্তি করুন। তা না হলে তো ও কিছুতেই যাচ্ছে না। তাছাড়া ওরও একটা ফিউচার আছে, ভবিষ্যৎ, পরজন্ম আছে।

এতগুলো দিন যদি ভূত হয়েই নষ্ট করে, তবে পরের জন্মের আয়ুটাও তো এখানেই কমে যাবে। তখন আবার অঘোরে মারা পড়বে।'

শিবকালীর কথার মধ্যে যথেষ্ট যুক্তি ছিলো। কিন্তু সে নাম করা গাঁজাখোর। আগের বছর মহালয়ার রাতে শিবকালী সারা সন্ধ্যা বেহুঁশ। গাঁজা খেয়ে কালীমন্দিরের হাঁড়িকাঠে মাথা দিয়ে আত্ম-বলিদানের চেষ্টা করেছিলো।

গেঁজেলের কথায় কোনো পাত্তা দেন নি হারুর বড়দা। তাছাড়া হারু যে মরেও রয়ে গেছে এটা তাঁদের এখন বেশ গা-সহা ব্যাপার। মা তো হারুকে ভালোমন্দ যা পারেন এখনো খাওয়ানোর চেষ্টা করেন। হারু রয়ে গেছে, ভালোই হয়েছে। হারুর জন্যে মা যেরকম কান্নাকাটি শুরু করেছিলেন এখন তবু সেটা করছেন না। চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছেন না বটে কিন্তু কাছাকাছি আছে, মার পক্ষে এটাই যথেষ্ট।

তবে মা নিজে দু' একটা গোলমাল করছেন হারুর ব্যাপারে তাঁর জীবিতে-মৃতে ভেদাভেদ দূর হয়ে গেছে। মাথা খারাপ নয় কিন্তু ব্যাপারটা অবাস্তব। সেদিন বড়মামা এসেছিলেন, যিনি পদ্মপুকুরের বড় উকিল রামজীবনবাবুর সেরেস্তায় মুহুরির কাজ করেন। তাঁরই ছেলে রামগতি উকিলের কাছে হারুর কথা ছিলো চাকরি করার।

মা সেদিন বড়মামাকে, বললেন, 'রামগতিবাবুর ওখানে হারুর কাজটা হতে পারে কি না?' বড়মামা রান্নাঘরের বারান্দায় একটা কাঁঠাল কাঠের পিঁড়িতে বসে মার সঙ্গে কথা বলতে বলতে একটা পাথরের বাটি থেকে গুড় মাখানো ফুটি খাচ্ছিলেন, কয়েক মাস আগে মৃত ভাগিনেয়ের চাকরির প্রস্তাব শুনে তাঁর হাতে কালো পাথরের বাটিটা পড়ে দু টুকরো হয়ে গেলো, তিনি আমতা আমতা করতে লাগলেন, 'হারু? হারু কোথায়? সে কি করে কাজ করবে?' হারুর মা ভাঙা পাথরের বাটির টুকরোগুলো মেঝে থেকে কুড়োতে কুড়োতে জবাব দিলেন, 'কেন, সে খায় দায়, ঘুরে বেড়ায়, কুড়ি বছর বয়স হতে চললো তার, সে কাজ করতে পারবে না। সন্ধ্যাবেলায় তো ঐ উঠোনের

বেলতলায় বসে থাকে, তুই আজ সন্ধ্যায় আসিস তোর সঙ্গে পাঠিয়ে দেবো রামগতিবাবুর বাড়িতে।'

বড়মামা বেল গাছটার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন, তখনো হারুর মা বলে যাচ্ছেন, 'তুই একটু উকিলবাবুকে বলিস, ছেলেটা বড় লাজুক, একটু আড়ালে আড়ালে থাকবে। তাই বলে কাজ কর্মে কোনো অসুবিধে হবে না।' তারপরে ব্যাখ্যা করে বললেন, 'এই তো কাল মাঝরাতে রান্নাঘরের চালের উপর বেপাড়ার দুটো হুলো বেড়াল এসে কি ঝগড়া, চেঁচামেচি। পাড়াসুদ্ধ লোকের ঘুম ভেঙে গেলো, কেউ জল ছিটোলো, কেউ ঢিল ছুঁড়লো, কেউ সেই গোলমাল থামাতে পারলো? অথচ আমি হারুকে ডাকতেই দুটো বেড়াল সুড়সুড় করে দৌড়ে দুদিকে পালালো।'

॥ তিন ॥

আত্মানং বিদ্ধি

'সমস্ত এ ছন্দভাঙা অসংগতি-মাঝে
সানাই লাগায় তার সারঙ্গের তান।'

রবীন্দ্রনাথ, সানাই।

আত্মারাম যে ছাত্র খুব ভালো ছিলো তা নয়। অবশ্য তাঁর কাকাবাবু অর্থাৎ ঠাকুর্দার কাকার মত সে দুবার এণ্ট্রান্স ফেল করে নি। এগারো ক্লাসের হায়ার সেকেণ্ডারি সে একেবারেই পাশ করেছিলো ওরিয়েন্টাল একাডেমি থেকে। তারপর আশুতোষ কলেজ থেকে বি এ পাশও করেছে ইতিহাস আর অর্থনীতি নিয়ে। বাংলা সাহিত্যের প্রতি তার গভীর অনুরাগ, ইস্কুলে সে বেশ কিছুদিন শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের কাছে পড়েছিলো।

আজকাল আর বেশি সময় করে উঠতে পারে না, আগে মাঝে মধ্যে ছুটির দিনে রবিবারে সে দেশপ্রিয় পার্কের সামনে সুতৃপ্তি রেষ্টুরেণ্টে

যেতো। সেখানে ছোটবড় অনেক লেখকের জটলা। সেখানে বছর দশেক আগে তার শংকর চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলাপ হয়েছিলো, ভারি সুবেশ, সুপুরুষ আর চমৎকার লোক ছিলেন তিনি। অল্প বয়েসে মারা গেলেন।

দেশপ্রিয় পার্কের পিছনেই বাড়ি ছিলো শংকর চট্টোপাধ্যায়ের, বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে সে বাড়িতেও বেশ কয়েকবার গেছে আত্মারাম।

কলেজে পড়ার সময় এবং তার পরেও বেশ কিছুদিন কিছু কিছু কবিতা লিখেছিলো আত্মারাম। বিশেষ কোনো বড় কাগজে সে সব কবিতা ছাপা হয় নি, সেই সময়ে তার মনে প্রশ্ন জাগে, আত্মারাম ভট্টাচার্য এই নাম কোনো আধুনিক কবি বা লেখকের হওয়া সম্ভব কিনা, সঙ্গত কিনা। সে ভেবেছিলো যদি কবিতা লিখতেই হয় তবে নামটা একটু ছেঁটে আত্মারামের রাম আর ভট্টাচার্যের আচার্য এই টুকু নিয়ে রাম আচার্য হলে বেশ চলনসই আধুনিক কবির নাম হতে পারে।

এই সময়ে আত্মারাম যে মেয়েটির সঙ্গে একটু প্রেম করতো সে মেয়েটি পড়তো তাদেরই কলেজে সকালবেলার মেয়েদের বিভাগে, যার আলাদা নাম যোগমায়া দেবী কলেজ।

এই যোগমায়া দেবী কলেজের বাংলা অনার্সের মেয়ে মনোরমা। মনোরমা নামটাও বেশ সাবেকি, তার সঙ্গে আত্মারামের বেশ ভালোবাসা হয়েছিলো। খুব বেশিদূর গড়ায় নি ব্যাপারটা। কয়েক কাপ চা, বসুশ্রী কফি হাউসে কয়েক ঘণ্টা কথাবার্তা, একদিন গ্লোব সিনেমায় পাশাপাশি বসে 'মাই ফেয়ার লেডি' দেখা আরেকদিন শীতের দুপুরে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের বাগানের একটা বেঞ্চিতে বসে একশো গ্রাম চিনেবাদাম দুজনে ভাগ করে খাওয়া, এইরকম টুকটাক তিন বছর। সামান্যই তিন বছর, কিন্তু আত্মারামের ক্ষুদ্র জীবনে সে তিন বছর সবচেয়ে দামী।

মনোরমার বাবা রেলের কি একটা চাকুরি করতেন, মনোরমার বি এ পরীক্ষার মাস দুয়েক আগেই ভদ্রলোক খড়্গপুরে বদলি হয়ে গেলেন। তখন পরীক্ষার পড়ার চাপ চলছে, তবু আত্মারামের সঙ্গে মনোরমার হাজরা পার্কে সপ্তাহে দুয়েকদিন বিকালে নিয়ম করে দেখা হতো।

মনোরমার বাবা বদলি হতেই বাবার সঙ্গে সেও খড়্গপুর চলে গেলো। খড়্গপুর থেকেই যাতায়াত করে বি এ পরীক্ষা দিয়েছিলো। তবে মনোরমাব সিট পড়েছিলো গোখেল কলেজে আর আত্মারামের চারুচন্দ্র কলেজে। দুজনেব মধ্যে পরীক্ষার সময় আর দেখা হয় নি, পাড়ার অন্য একটি সহপাঠিনীর মুখে আত্মারাম শুনেছিলো মনোরমা পবীক্ষা দিচ্ছে। মনোরমা আর আত্মাবামের বিষয়ের কম্বিনেশন এক ছিলো না, পরীক্ষার মধ্যে সময় কবে আত্মারাম আর মনোরমার খোঁজ নিতে পাবে নি। একদিন আত্মারামেব পরীক্ষা ছিলো না, মনোরমার ছিলো, সেদিন যাবো যাবো করেও পরীক্ষাব হলে আত্মারামেব যাওয়া হয় নি। তারপর মনোরমার সঙ্গে আত্মারামের আর দেখা হয় নি। খড়্গপুরের ঠিকানা আত্মারাম জানে না, আর সে বড়ই লাজুক, চিঠিপত্র লেখা হয়ে ওঠেনি। মনোরমার রেজাল্ট কি হয়েছিলো সেটা জানার তাব খুব ইচ্ছে ছিলো, কিন্তু আর জানতে পারে নি। রোল নম্বরটা আত্মারাম জানতো না, পাড়ার মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করাতে বলেছিলো, 'বোধ হয় ইংরেজিতে ব্যাক পেয়েছে, ওর সঙ্গে দেখা হয় নি। আর ওর রোল নম্ববটাও ঠিক জানি না।'

মনোরমার দোষ নেই, সে বছব অবশ্য ইংরেজিতে অনেকেই ফেল করেছিলো। ভীষণ উল্টোপাল্টা প্রশ্ন হয়েছিলো। আত্মারাম নিজেও কোনো রকমে পাশ করেছে, ইউনিভার্সিটি পাঁচ মার্ক গ্রেস দিয়েছিলো তাই সে বেরিয়ে যায়।

মনোরমা কবিতা লিখতো কিনা সেটা আত্মারাম হাজার চেষ্টা করেও জানতে পারেনি কিন্তু কবিতা সে খুব ভালোবাসতো, আধুনিক কবিতার খোঁজখবর রাখতো খুব। সেই জোর করতো, 'আত্মারাম কোনো এখনকার কবির নাম হতে পারে না। আত্মারাম ভট্টাচার্য নামে লিখলে মনসামঙ্গল লিখতে হবে।' আত্মারাম দু একজন গদ্যময় তরুণ কবির নামোল্লেখ করতে যাচ্ছিলো, মনোরমা বাধা দিয়ে বললো, 'কবির নাম হবে বিষ্ণু দে, শঙ্খ ঘোষ। শুনলেই বোঝা যাবে কবি।'

মনোরমার প্ররোচনাতেই আত্মারাম শেষ পর্যন্ত নাম বদল করে রাম

আচার্য হতে চেয়েছিলো। রাম আচার্যের প্রথম কবিতার বইয়ের জন্যে একটা নামও সে ঠিক করে ফেলেছিলো, চমৎকার স্মার্ট নাম ; কবির নামের মতোই একদম টানটান, ঋজু, 'সামনে দারুণ দিন আসছে।'

আর একটা ক্ষীণ দুরাশা ছিলো সেই যুবক কবির মনে, যদি সাহস হয়, যদি সাহস করে মনোরমার কাছে অনুমতি চাওয়া যায়, যদি দয়া করে অনুমতি দেয় মনোরমা, তাহলে সে তার প্রথম কবিতার বই উৎসর্গ করবে, মনোরমাকে, লিখে দেবে, 'মনোরমা, শুধু মনোরমার জন্যে।'

সত্যিই আশ্চর্য লাগে আত্মারামের, মনোরমা এত সহজে, এত আলতো ভাবে অদৃশ্য হয়ে যাবে তার সম্মুখ থেকে সে মোটেই ভেবে উঠতে পারেনি।

সেই এক শীতেব সন্ধ্যা, কালীঘাটের ট্রাম রাস্তা তখনো পাতালরেল খুঁড়ে ফেলেনি, ট্রামগুমটির সামনে দাঁড়িয়ে মনোরমা বললো, 'আমরা বাড়ি সুদ্ধ সবাই পরশুদিন খড়্গপুর চলে যাচ্ছি। ওখান থেকে এসেই পরীক্ষা দেবো। এর মধ্যে আর দেখা হবে না, পরীক্ষার সময় দেখা হবে।'

মনোরমারা থাকতো মনোহরপুকুর রোডের দিকে একটা ভাড়া বাড়িতে। মনোহরপুকুরে বাসা বলে আত্মাবামের দুএকজন বন্ধু মনোরমার সম্পর্কে ঠাট্টা করে উল্লেখ করতো আত্মারামের মনোহরা। অবশ্য মনোরমার সামনাসামনি ইয়ার্কি করার ছেলে খুব বেশি ছিলো না। শ্যামলী, দোহারা চেহারার মেয়েটির একটা ভারিক্কি ভাব ছিলো। মা মরা দুই ছোট ভাই আর এক বোন সুদ্ধ প্রৌঢ় পিতা আর বৃদ্ধা ঠাকুমার মাঝারি একটা সংসারের বেশ বড় দায়িত্বই তাকে পালন করতে হয়েছে অতি নাবালিকা বয়স থেকে।

সাদাসিধে, সরল মনোরমার বিশেষ কোনো উচ্চাশা ছিলো না, কিন্তু সে নির্বোধ ছিলো না। মনোরমা যখন থেকে আত্মারামদের বাড়ির সামনে দিয়ে কালীঘাট মহাকালী পাঠশালায় পড়তে যেতো তখন থেকেই মনোরমার মুখ চেনা তার। এরপরে মুখচেনাটা পরিচয়ের পর্যায়ে এসে পৌঁছেছিলো এক পাঁউরুটির লাইনে।

সেবার একটা পাঁউরুটির দুর্ভিক্ষ ঘটে গেলো কলকাতায়। একদিকে পাঁউরুটি তৈরি হচ্ছে না, রুটির কারখানাগুলো গম পাচ্ছে না অন্যদিকে যে মুহূর্তে রটে গেলো বাজারে পাঁউরুটির অভাব, যে সব লোকেরা কোনোদিন এ দ্রব্য খায়নি, খাবে না, তারা মরীয়া হয়ে উঠলো এক টুকরো পাঁউরুটি যোগাড় করার জন্যে।

আত্মারামের সংসারে, কালীঘাটের এই ভট্টাচার্যদের বাড়িতে তিরিশ চল্লিশ বছর আগেও পাঁউরুটির প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিলো, যেমন নিষিদ্ধ ছিলো, রসুন, মুরগি বা মুরগির ডিম।

আত্মারামের মাতামহ ছিলেন গয়া জেলার সাব জেলর। বিহারের অনেক জেলা সদরে আর মহকুমা শহরে তিনি ঘুরেছেন। মামার বাড়িতে রসুন পেঁয়াজ, ডিম পাঁউরুটি সবই চল ছিলো। পুরুষেরা পাজামা পরতো, মেয়েরা রান্না করার বা গেরস্থালির কাজ করার সময়ে কোমরে একটা তোয়ালে জড়িয়ে নিতো। বিকেলে শহরের বাজারে টাঙ্গা করে বা পায়ে হেঁটে বাজার করতে যেতো বাড়ির মেয়েরা।

পিতৃসংসার থেকে কিছুটা আধুনিকতার বাতাস বয়ে এনেছিলেন আত্মারামের মা। তিনিই আত্মারামদের বাড়িতে প্রথম পাঁউরুটি প্রচলন করেন। তখন অবশ্য আত্মারাম জন্মায় নি এবং আত্মারামের নীতি-পরায়ণা পিতামহী পরলোকে গিয়েছেন।

সে যা হোক। আমাদের এই ক্ষুদ্র কাহিনীতে ভট্টাচার্য-বাড়ির জটিল ও ক্ষয়িষ্ণু ইতিহাস থেকে আমরা যথাসাধ্য দূরে থাকার চেষ্টা করবো। আমাদের আপাতত দৃষ্টি ষাটের দশকের মধ্যভাগে হাজরার মোড়ে একটি অতিদীর্ঘ পাঁউরুটির লাইনে মেয়েদের এবং ছেলেদের দুটো লাইন। আত্মারাম আর মনোরমা দুজনে দু লাইনে প্রায় মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে। এ রকম একটি অতি অকিঞ্চিৎকর কাজে নিজেকে নিযুক্ত করার লজ্জা উভয়েরই এবং সেইদিনই তাদের প্রথম আলাপ হলো। আত্মারাম মনোরমাকে বললো, 'কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছো?' তখনো আত্মারামের সে বয়েস হয়নি যে বয়েসে সমবয়সিনীকে আপনি বলা যায় অবশ্য এরই কাছাকাছি সময়ে কলকাতায় সম্বোধন বিপ্লব আরম্ভ

হয়েছে, তরুণ-তরুণীরা এমন কি প্রেমিক-প্রেমিকা পর্যন্ত পরস্পরকে তুই বলে সম্বোধন করা শুরু করেছে।

আত্মারামের সরাসরি প্রশ্নে মনোরমা সঙ্কোচ কাটিয়ে বললো, 'তুমি যতক্ষণ, আমিও ততক্ষণ।' লাইন অত্যন্ত ঢিমে তালে এগোচ্ছে, খুচরোর গোলমাল, সরাসরি বাঁধা দাম তেতাল্লিশ না চুয়াল্লিশ পয়সা অনেকেই ঠিক মতো খুচরো আনে নি। অনেকে এমনি এমনিই রাস্তায় একটা লাইন দেখে ঝোঁকের বসে এবং হাতে কিছু করার নেই বলে দাঁড়িয়ে গেছে।

পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আত্মারাম তার সাবালকত্ব প্রমাণের জন্য মনোরমাকে বললো, 'ছাখো তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তোমাকে মাঝে মধ্যে লাইনে দাঁড়াতে হয়। যদি কোথাও ছাখো অনেক লাইন, তার মধ্যে দু একটা লম্বা আর দু একটা ছোট কোনটায় দাঁড়াবে?' মনোরমা এই অযাচিত চপল প্রশ্নের খুব সংক্ষিপ্ত জবাব দিলো, 'ছোটো লাইনটায়।'

আত্মারাম বুদ্ধির পরিচয় দিলো এবার, বললো, 'ওইটাই ভুল হবে। সবসময় জানবে ছোটো লাইনটাতেই সবচেয়ে বেশি দেরি হয়, আর বড়টা তাড়াতাড়ি এগোয়।'

সেদিন অবশ্য সেই লাইনে শেষ পর্যন্ত আত্মারাম বা মনোরমা কেউই রুটি পায় নি। কি একটা গোলমাল বেঁধে আর রুটি বিলি হয় নি, সব ভেস্তে যায়। তবে ভাঙা লাইন থেকে বেরোনোর পর মনোরমার একটা কথায় মর্মাহত হয়েছিলো আত্মারাম, বাড়ির দিকে দ্রুত ফিরতে ফিরতে মনোরমা বলে গেলো, 'ধ্যুৎ। এতো কথা বলে নাকি ভিড়ের মধ্যে!' বলে একটা ভ্রূভঙ্গি করে সে দ্রুত মনোহরপুকুরের দিকে চলে গেলো।

এর পরে অনেকদিন আর মনোরমার সঙ্গে আত্মারামের বিশেষ কথাবার্তা হয়নি। আত্মারাম অস্বস্তি বোধ করেছে, রাস্তাঘাটে দেখা হলে এড়িয়ে গেছে। মনোরমাও খুব পাত্তা দেয় নি।

বছর দেড়েক পরে আশুতোষ কলেজের সামনে দেখা। উচ্চতর

মাধ্যমিকের ফল বেরিয়েছে, আত্মারাম ভর্তি হওয়ার খোঁজ খবর নিতে গেছে। তার খুব ইচ্ছে ছিলো, বিজ্ঞান নিয়ে পড়ে আর না হলে বাংলায় অনার্স। কিন্তু রেজাল্ট তত ভালো হয় নি। দুটোর কোনোটাই সে পেলো না। অঙ্কে কম নম্বর পেয়েছে, কিন্তু বাংলায় কি করে এত কম পেলো, সেটা তার খুব দুঃখ।

কলেজের গেটের মুখেই মনোরমার সঙ্গে দেখা। সে নিজেই এগিয়ে এসে আলাপ করলো, 'তুমিও তো এবারেই পাস করলে, এখানেই ভর্তি হচ্ছো বুঝি?' আত্মারাম বললো, 'দুটো প্রশ্নেরই উত্তর হ্যাঁ। আর তুমিও কি এখানে ভর্তি হচ্ছো?'

মনোরমা বললো, 'আমাদের তো কলেজ সকাল বেলায়, আমি বাংলার অনার্স নিচ্ছি।'

আত্মারামের নিজেরো খুব ইচ্ছে ছিলো বাংলায় অনার্স নেওয়ার, সে সরল ভাবে বললো, 'আমিও নেবো ভেবেছিলাম বাংলায় অনার্স, কিন্তু নম্বর ভালো নেই, দিলো না। তোমার নিশ্চয় খুব ভালো নম্বর।' মনোরমা মৃদু হেসে বললো, 'তেমন কিছু নয়, টায়েটোয়ে ফার্স্ট ডিভিসন। তার মধ্যে আবার ইংরেজিটা প্রায় ফেল করতেই বসেছিলাম।'

কলেজ আরম্ভ হওয়ার পরে মনোরমার সঙ্গে আত্মারামের প্রায় নিয়মিতই দেখা হতো, অবশ্য মাত্র কয়েক মুহূর্তের জন্যে। মনোরমাদের কলেজ ভাঙতো, আত্মারামদের কলেজ শুরু হতো। একই দালান, একই ঘর চেয়ার টেবিল, মনোরমারা বেরোতো, আত্মারামরা ঢুকে যেতো।

এই যাতায়াতের পথে কখনো কলেজের গেটে, কখনো পার্কের সামনে ফুটপাথে অথবা কখনো হাজরার মোড়ে বান্ধবী বেষ্টিতা মনোরমার সঙ্গে ক্ষণিক দৃষ্টিবিনিময় হতো তার। এক আধ দিন সন্ধ্যাবেলায় বা বিকেলের দিকেও দেখা হতো। দুজনেরই অভ্যেস ছিলো হাজরার মোড়ে ফুটপাথের উপর নীলকণ্ঠের পত্রিকার দোকানে নানা পত্রপত্রিকার পাতা ওলটানো। তখন কদাচিৎ দু একটা কথাও হয়েছে।

এই সময়েই আত্মারামের দু একটা কবিতা এদিকে ওদিকে দু একটা কাগজে কষ্টেসৃষ্টে বার হচ্ছে। যে সব কাগজে সে কবিতা পাঠিয়েছে,

ভয়ে ভয়ে সে সব কাগজ খুলে দেখতো তার মধ্যে তার নিজের কোনো কবিতা বেরিয়েছে কিনা। এই রকম এক পড়ন্ত বিকেল বেলায়, তখন যতীন দাস পার্কের পশ্চিম থেকে ঈষৎ রক্তিম রোদ হাজরা মোড়ের ধূলিমলিন, চটাওঠা পেভমেন্টের উপর এসে পড়েছে, কোনাকুনি পার্কের বুড়ো নিমগাছের ডালে অজস্র সবুজ পাতার মধ্যে লক্ষ লক্ষ ক্ষীণ সাদা ফুল হাওয়ায় মৃদু আন্দোলিত হচ্ছে, কম্পিত বক্ষে আত্মারাম কৃত্তিবাস পত্রিকা খুলে দেখলো সাতচল্লিশ পৃষ্ঠায় নিচের দিকে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের একটা দীর্ঘ কবিতার নীচে তার খুব ছোট একটা কবিতা ছাপা হয়েছে।

আত্মারামের বুকের মধ্যে রক্ত ছলকে উঠলো এবং সেই মুহূর্তে সে লক্ষ্য করলো তারই পাশে মনোরমা দাঁড়িয়ে রয়েছে, সস্তা ছাপা নীল ফুল শাড়িতে বিকেলের কনে দেখানো আলোয় মনোরমাকে অতুলনীয়া মনে হচ্ছে।

আত্মারামকে একটু লাজুক স্বভাবেরই বলা চলে, কিন্তু আজ যেন কি হলো হঠাৎ, খুব দামি দুটো টাকা দিয়ে নীলকণ্ঠের কাছ থেকে কৃত্তিবাস কাগজটা কিনে ফেললো, তারপর মনোরমাকে বললো, 'আমার সঙ্গে একটু আসবে তোমাকে একটা জিনিস দেখাবো?'

আত্মারামের ভয় ছিলো মনোরমা হয়তো আপত্তি করবে, সে কিন্তু কোনোরকম ইতস্তত না করে বললো, 'কোথায় যেতে হবে।'

আত্মারাম বললো, 'সামনের পার্কটায় বড় ভিড়। চলো কালীঘাট পার্কে যাই।' কালীঘাট পার্কের এক পাশে একটা বেঞ্চিতে মনোরমার থেকে বেশ একটু তফাতে বসে কৃত্তিবাস কাগজের সাতচল্লিশের পৃষ্ঠাটা খুলে সেই ছোট কয়েক লাইন কবিতাটা বার করে মনোরমাকে দেখালো, 'এই ছাখো, এই কবিতাটা আমি লিখেছি।'

তখনো রৌদ্রের শেষ আভা নীল আকাশের গায়ে মেঘে মেঘে লেগে রয়েছে। সেই আলোয় একবার পত্রিকার পৃষ্ঠার দিকে, আরেকবার আত্মারামের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো মনোরমা, অবাক হয়ে যাওয়া গলায় সে কোনো রকমে বললো, 'সত্যি!' তারপর আলো ফুরিয়ে

যাওয়ার আগে খুব নরম করে নিজের মনে মনে দুবার, তিনবার, চারবার পড়লো,

তুমি থেকো

আত্মারাম ভট্টাচার্য

রাস্তা দিয়ে যাবো
অথচ তোমার সঙ্গে দেখা হবে না,
এমন যেন কোনোদিনো, কখনো না হয়।
যে রাস্তা দিয়েই যাই
তুমি সেখানেই থেকো।

ঐ পৃষ্ঠার একটু ওপরে চোখ পড়তেই মনোরমা দেখলো শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার শেষ পংক্তি জুলজুল করছে,

মুঠো ভরা রঙ বেরঙের টিকিট
ঘাঁটলে কি একটাও সাচ্চা বেরোবে না।

দেখতে দেখতে ছায়া আর অন্ধকার ঘন হয়ে এলো। কালীঘাট পার্কের লতাপাতার আড়ালে ইলেকট্রিকের আলো, আর সতীশ মুখার্জি রোডের রাস্তায় সদ্য বসানো নিয়নের নীল রশ্মি মায়াজাল রচনা করলো নব-পৃথিবীর এক প্রান্তে।

অনেকক্ষণ পরে আত্মারাম বললো, 'জানো, আমার কবিতাটা কিন্তু অনেক বড় ছিলো। প্রায় সবটাই কেটে দিয়ে শুধু শেষের প্যারাটা ছেপেছে।'

মনোরমা একটু থেমে থেকে কি যেন একটু চিন্তা করে বললো, 'কবিতাটা পড়ে কিন্তু সেটা কেউই ধরতে পারবে না।' বলে আত্মারামের মুখের দিকে তাকালো, কথাটায় আত্মারাম সুখী হলো না দুঃখিত হলো, সেটা বুঝতে পারলো না মনোরমা।

॥ চার ॥

সরকারমশাই ও হারু

—উঠতে পারিতো যদি সহসা, প্রকশি সেই সব হৃদ্‌যন্ত্র মানবের মতো আত্মায় তাহলে তাদের মনে সেই এক বিদীর্ণ বিস্ময় জন্ম নিতো ;

—জীবনানন্দ দাশ, সেই সব শেয়ালেরা।

বৈশাখ মাসের সন্ধ্যেবেলা। আকাশ ঘনকালো হয়ে প্রচণ্ড ঝড় বৃষ্টি আসছে। কালীঘাটের মোড়ের দিক থেকে হালদার পাড়ার মধ্য দিয়ে নরহরি সরকার কালীঘাট বাজারের সামনে তাঁর বাসা বাড়িতে দ্রুত পা চালিয়ে ফিরছিলেন।

ঝোড়ো বাতাস কিছুক্ষণ ধরে চলছিলো কিন্তু হঠাৎ বাতাস কমে গিয়ে প্রবল বেগে বৃষ্টি এলো। বৃষ্টির প্রচণ্ড তোড় তার উপরে নরহরি সরকার তাড়াতাড়ি হাঁটতে পারেন না, তাঁর বাঁ পায়ে একটা পুরনো ব্যথার টান আছে।

নরহরি সরকারকে এ পাড়ার প্রায় সকলেই সরকারমশায় বলে। ভদ্রলোক কালীঘাটের পুরনো লোক নন, বাড়ি পূর্ববঙ্গের এক গ্রামে, কলকাতায় ওয়ালেস কোম্পানির অফিসে কেরানির কাজ করেন। আজ প্রায় পঁচিশ বছর কালীঘাটের এই অঞ্চলে সরকারমশায় বাসাভাড়া করে আছেন। নিরীহ গোবেচারা মানুষ, বিদেশী লোক বলে পাড়া প্রতিবেশী সকলের সঙ্গেই সদ্ভাব রেখে চলেন।

সেটা উনিশশো বারো সাল। সাধারণত সব অফিসযাত্রী-ই হাতে একটা ছাতা নিয়ে বেরোত। সরকার মশায়ের হাতেও একটা ছাতা ছিলো। জোর হাওয়ার জন্যে তিনি প্রথমে ছাতাটা খুলতে খুব একটা ভরসা পান নি। কিন্তু হাওয়া কমে যখন বৃষ্টি নেমে এলো সরকার মশয় ছাতাটা খুলে মাথায় দিয়ে এগোতে লাগলেন।

গলির মোড়ের ভট্টাচার্যদের বাড়ির ওখানটায় গ্যাসের বাতিটা গত পরশুদিন থেকে জ্বলছে না। দিনকে দিন কি হাল হচ্ছে কলকাতার। চারদিকে সবরকম কাজকর্মে ঢিল পড়ছে। কর্পোরেশন তো খুবই

ফাঁকিবাজ হয়ে পড়েছে। এই বৃষ্টির মধ্যে ও জায়গাটা আবার ঘুবঘুট্টি অন্ধকার। ভট্টাচার্য বাড়ির বাইরের রোয়াকে আগে হৈ হুল্লোড়, কথা বার্তা হতো। কিন্তু মোহনবাগানের ফাইনাল জেতার দিন রাতে হঠাৎ ওদের ছেলেটা গলায় ভাত আটকে মরে গিয়ে বাড়িটা কেমন নিঝুম হয়ে গেছে।

ভট্টাচার্য বাড়ির ঠিক সামনে এসে হঠাৎ একটা কথা মনে পড়লো সরকারমশায়ের। সেই ছেলেটা যার নাম ছিলো হারু, সেই হারু নাকি ভূত হয়েছে। এখনো তাকে নাকি খেতে দিতে হয়, সে দু-একটা টুকটাক গোলমাল যে করে না, তাও নয়। তবে ঠিক দাঁত খিঁচোনো, নাকি-কাঁদুনে, ভয় দেখানো ভূত সে নয়। সরকারমশায় সেটা শুনেছেন।

এই ভাবতে ভাবতেই হঠাৎ একটা কাণ্ড ঘটলো। অন্ধকারের মধ্যে কিছু বোঝা গেলো না ব্যাপারটা কি হলো হঠাৎ সরকারমশায়ের হাত থেকে এক ঝটকা কে যেন ছাতাটা কেড়ে নিয়ে ভট্টাচার্য বাড়ির মধ্যে ঢুকে গেলো।

অন্ধকারের মধ্যে বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতেও সরকারমশায় ঠাহর করতে পারলেন ভট্টাচার্য বাড়ির সদর দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ। কিন্তু যতদূর মনে হলো ছাতটা নিয়ে কে যেন ঐ দরজার মধ্যে দিয়েই দৌড়ে ঐ বাড়ির মধ্যে ঢুকে গেলো।

সরকারমশায় এগিয়ে যাচ্ছিলেন ভট্টাচার্য বাড়ির বন্ধ দরজায় ধাক্কা দিতে। এই সময় কেমন একটা হিমঠাণ্ডা হাওয়া এসে লাগলো তার গায়ে। একটু শিউরে উঠে থমকে দাঁড়ালেন। এ নিশ্চয়ই হারুর কাণ্ড। ঐ ছেলেটাই তার ছাতাটা কেড়ে নিয়েছে। অল্প বয়সে ছেলেটা একটু বখা ছিলো, সরকারমশায়ের এক ভাগ্নে দেশ থেকে তাঁর কাছে এসে থাকতো কলকাতায় পড়াশুনো করার জন্যে, তাঁর সেই ভাগ্নে শ্যামলাল এই হারুর সঙ্গে একক্লাসে চেতলা ইস্কুলে পড়েছে। সেই সময়ে তিনি এই হারুকে আর শ্যামলালকে দেখেছিলেন কালীঘাটের খালের সিঁড়ির সবচেয়ে নিচুধাপে বসে দুই বন্ধুতে মিলে কি একটা বিড়ি না বার্ডসাই মৌজ করে ফুঁকছে। খুব রাগ হয়েছিলো সরকারমশায়ের।

মা মরা ছেলে শ্যামলাল, তাকে তার বাবা, সরকারমশায়ের ভগ্নীপতি ; সেই পাবনা থেকে কলকাতায় পাঠিয়েছেন মামার কাছে লেখাপড়া শেখার জন্যে, সেই ছোকরা কিনা খালপারে ইয়ার বন্ধুর সঙ্গে বসে নেশাভাঙ করছে।

সরকারমশায় ভাগ্নেকে যথেচ্ছ গালাগাল করলেন, অবশেষে হারুকেও ধমকালেন, 'তুমি অতি বখা ছেলে, তুমি আমার ভাগ্নের সঙ্গে মোটেই মেলামেশা করবে না।'

সরকারমশায়ের শাসানির জন্যেই হোক বা অন্য কোনো কারণেই হোক শ্যামলাল কিন্তু একবারেই এণ্ট্রান্স পাস করতে পেরেছিলো, সে জায়গায় হারু দুবার ফেল করলো।

তা যাই হোক, এই মুহূর্তে যে হারু সেদিনের শাসানির প্রতিবাদে আজ এতকাল পরে ছাতাটা কেড়ে নিয়ে শিক্ষা দিলো সেটা বুঝতে একটুও বিলম্ব হলো না সরকারমশায়ের। হিম হওয়ার এবং শীতল বৃষ্টির আকস্মিক শিহরণের সঙ্গে জড়িত একটা অমানুষিক ভয় দেখা দিলো তাঁর মনের মধ্যে।

দশ আনা দামের একটা ছাতার জন্যে শেষে বিপদে পড়বো নাকি। হারু পাড়ার ছেলে বা ভাগ্নের সহপাঠী হলেও ভূত তো। সামনে একটা বড় তেঁতুলগাছ ; আর একটু এগিয়ে গেলে মহাকালী পাঠশালার সামনে দু-একটা দোকানপাট, আলো-টালো আছে। তা ছাড়া এই বৃষ্টি আর অন্ধকারের মধ্যে আশেপাশে একটি লোকজন চোখে পড়ছে না। খোঁড়া পা নিয়ে রীতিমত সঙ্কিত সরকারমশায় যথাসাধ্য জোরে হেঁটে সামনের তেঁতুলতলাটা পার হয়ে গেলেন। তাঁর বারবার ভয় হচ্ছিলো হয়তো পিছন থেকে এসে হারু ছাতাটা দিয়ে তাঁর মাথায় মারবে।

তেঁতুলতলা পেরোতেই বৃষ্টির ঝাপটা অনেকটা কমে এলো, গ্রীষ্মের সায়াহ্নের ঝড়বৃষ্টি যেমন তাড়াতাড়ি আসে তেমনি তাড়াতাড়ি চলে যায়। বৃষ্টি কমেছে। এদিকটায় রাস্তায় দোকানপাট লোকজনও দেখা যাচ্ছে।

সরকারমশায় কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত বোধ করলেন। তিনি ভীতু বা

সংস্কারগ্রস্ত লোক নন। বড়ো সাহেব কোম্পানির ছোটো বাবু। জীবনে অনেক দেখেছেন, শুনেছেন। ভূত বিশ্বাস করেন না, কিন্তু ভয়টা কেন যেন আছে। এই তো এখনো বুকটা দুরদুর করছে। মনে পড়লে, কিংবা খেয়াল থাকলে হয়তো রামনামও জপ করতেন।

বাসায় পৌঁছাতে সরকারমশায়ের গৃহিণী অবাক হয়ে গেলেন, 'বৃষ্টিতে ভিজে একদম চু চুর হয়ে গেছেন? কোথাও একটু দাঁড়াতে পারতেন।' তারপর একটু লক্ষ্য করে বললেন, 'এ কি আপনার ছাতা কি হলো? ছাতাটা হারিয়ে এলেন নাকি?'

সরকারমশায় ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললেন, 'আগে একটা গামছা দাও বলছি।' গামছা দিয়ে মুছে, হাত পা ধুয়ে শুকনো কাপড় পরে, খাটের উপর বসে একটা কাঁসার বাটিতে নারকেলের নাড়ু দিয়ে মুড়ি খেতে খেতে গৃহিণীকে সরকারমশায় বললেন, 'হারুদের বাড়ির সামনে, ঐ তেঁতুলতলাটার একটু আগে, হারু বোধহয় ছাতাটা কেড়ে নিয়ে গেলো।'

হারুর মৃত্যুর পরের আচার আচরণ ইতিমধ্যে পাড়ার লোকেরা কেউ কেউ জেনেছে। সরকার গৃহিণীও জেনেছেন। এইতো সেদিন রাতে মুখুজ্যেদের বাড়ির হেঁসেলে ঢুকে শিলনোড়াটা যে হারুই ভেঙেছে সে বিষয়ে মুখুজ্যেদের বাড়ির ঠিকে চাকরানী কাত্যায়নী তাকে বলেছে। যদিও মুখুজ্যে গিন্নী বলেছেন কাত্যায়নীই আগের দিন ভেঙে জোড়া দিয়ে রেখে গিয়েছিলো। কাত্যায়নী দিব্যি দিয়ে বলেছে সে করেনি, সে আরো বলেছে, এটা হারুর কাণ্ড। হারু ছাড়া এ কাজ কে করবে, অত শক্ত একটা নোড়া কে ভাঙতে পারবে, সাধারণ মানুষের গায়ের জোরে হবে না। হারুর ছাতাকাড়া শুনে সরকারগৃহিণী একটুও বিস্মিত হলেন না। শুধু কয়েকবার রাম রাম করে ঠাকুরঘরে ঢুকে একটুকরো তুলসীপাতা এনে স্বামীর কানের পিছনে গুঁজে স্বামীর দুই কানে একশো আটবার রাম-রাম জপ করলেন।

পরের দিন সকালবেলা বাজার যাওয়ার আগে সরকারমশায় একবার ভট্টাচার্য বাড়িতে গেলেন। মহাকালী পাঠশালার সামনে থেকে তেঁতুল-

তলায় ওপারে ভট্টাচার্যদের পুরনো দোতলা বাড়ি দেখা যাচ্ছে। বৈশাখের সকালের উজ্জ্বল রোদে, রাস্তাঘাট বাড়িঘর উদ্ভাসিত। আগের দিন সন্ধ্যার বৃষ্টিতে ধুয়ে এখন সব ঝকঝক করছে। তেঁতুলগাছের সবুজপাতায় আলোর ঝিকিমিকি, দু-একটা টিয়াপাখি উড়ে উড়ে ডাকছে।

সরকারমশায় অবাক হয়ে গেলেন, কাল রাতে এখানেই এত ভয় পেয়েছিলেন। সত্যি, সময় ভেদে কত রকম কি হতে পারে একই জায়গায়। একই মানুষের।

ভট্টাচার্য বাড়ির সদর দরজা খোলা। চেনা শোনা বাড়ি, অনেকদিন এ পাড়ায় বাস হয়ে গেলো তাঁর। একটা গলাখাঁকারি দিয়ে উঠোন দিয়ে ঢুকে পড়লেন। সামনের বারান্দায় হারুর বিধবা মা, ভট্টাচার্য বাড়ির বুড়ি গিন্নি বড় বৌকে রান্নার চাল একটা তামার বাটি দিয়ে মেপে দিচ্ছেন। সরকারমশায়কে দেখে দুজনেই তাড়াতাড়ি মাথায় ঘোমটা টানলেন।

সরকারমশায় একটু অপ্রস্তুত হলেন এত সকালে হুট করে গৃহস্থ বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়া উচিত হয় নি। কিন্তু সেই মুহূর্তে তাঁর চোখে পড়লো উঠোনের একপাশে বারান্দার গায়ে ঠেশ দিয়ে দাঁড় করানো রয়েছে তাঁর কালকে রাতের ছাতাটি।

সরকারমশায় মাঝে মাঝে ছাতা হারিয়ে ফেলেন বলে তাঁর গিন্নি নীল সুতো দিয়ে ছাতার মধ্যে একটা ফুল তুলে দিয়েছেন যাতে ছাতাটা হারিয়ে গেলে চেনা যায়। সরকারমশায় একটু এগিয়ে যেতেই ছাতাটার ফিতের কাছে সেই নীলফুলটা দেখতে পেলেন। তিনি কোনো ভূমিকা না করেই হারুর মাকে বললেন, 'এই ছাতাটা আমার, আমি নিয়ে যাচ্ছি।' 'হারুর মা জানালেন, 'কালকে বৃষ্টির পরে দেখি উঠোনে পড়ে আছে। যা হাওয়া দিচ্ছিলো, ভাবলাম বুঝি রাস্তার কোনো লোকের হাতের ছাতা বাতাসে দমকা উড়ে আমাদের পাঁচিল টপকে বাড়ির মধ্যে পড়েছে।'

সরকারমশায় এ নিয়ে আর বিশেষ কথা না বাড়িয়ে ছাতাটা নিয়ে বাজারের দিকে রওনা হলেন। বাজারের পথে একটু এগোতেই হারুর বড়দা চারুবাবুর সঙ্গে দেখা। তিনিও বাজার সেরে বাড়ি ফিরছেন।

চারুবাবু সরকারমশায়ের সমবয়সী। দুজনে বেশ বন্ধুত্ব আছে। চারু ভট্টাচার্য ভবানীপুর পোস্ট অফিসে কাজ করেন।

চারুবাবুকে দেখে সরকারমশায় দাঁড়িয়ে গেলেন, 'আপনাদের বাড়ি থেকে ছাতাটা নিয়ে এলাম।' ছাতাটা দেখিয়ে বললেন। দেখা গেলো চারুবাবু ব্যাপারটা জানেন, 'ও আপনার ছাতা বুঝি এটা? আপনার হাত থেকে ঝড়ের সময় উড়ে গিয়েছিলো বুঝি?'

সরকারমশায় যে কথাটা বলার জন্যে সকালবেলা উঠে ভট্টাচার্য বাড়িতে গিয়েছিলেন এবং কি করে বলবেন তা নিয়ে অনেক ভাবনা চিন্তা করেছেন, এই মুহূর্তে দুম করে সেটা বলার সুযোগ পেয়ে গেলেন। তিনি সরাসরি বললেন, 'ঠিক উড়ে গেছে বোধহয় নয়। আমার কেমন যেন ধারণা ঝড়ের সময় হারু এসে আমার হাত থেকে ছাতাটা কেড়ে নিয়ে আপনাদের বাড়ির মধ্যে ঢুকে গিয়েছিলো।'

ভবানীপুর পোস্ট অফিসের দুঁদে সাবপোস্টমাস্টার চারু ভট্টাচার্য মশাই মৃত ভাইয়ের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ শুনে খুব বেশি চমকালেন বলে মনে হলো না। আসলে তাঁর এরকম শোনা অভ্যেস হয়ে গেছে। এখনো পর্যন্ত তাঁর কাছে হারুর অলৌকিক উৎপাত সম্পর্কে কোনো প্রত্যক্ষ্য প্রমাণ নেই। তাঁর ধারণা এ সবই বাজে গুজব, কিছুটা রটেছে মাতৃদেবীর জন্যে, কেন যে হারুর জন্যে তিনি উঠোনে খাবার রেখে দেন। ছুঁচো, ইঁদুর কিংবা বেড়ালে খেয়ে নেয়। মা ভাবেন হারু খেয়েছে।

চারুবাবু একবার ভাবলেন, সরকারমশায়ের ভুল হয়েছে, ঝড়েই উড়ে গেছে ছাতাটা। তারপর ভাবলেন নরহরি সরকার তো গেঁজেল শিবকালী পাল নয়, তাঁর কথাটা খেলো হতে পারে না। তাছাড়া আরো দশ জন হারুর ব্যাপারে দশ রকম কথা বলছে, সেটাও তাঁর কানে আসছে তিনি বিষয়টাকে উড়িয়ে দিতে পারলেন না, শুধু একটু চুপ করে শুনে সরকারমশায়ের কাছে জানতে চাইলেন, 'কি করা যায় হারুকে নিয়ে বলুনতো নরহরিবাবু?'

এ সম্পর্কে কোনো সহজ সমাধান সত্যিই জানা নেই সরকারমশায়ের। তবে হারু যখন ভট্টাচার্য বাড়ির ভূত, হারুকে সামলানোর দায়িত্বও

অবশ্যই তাদেরই। সে যা হোক, এরকম ক্ষেত্রে অন্যেরা যে রকম বলে সরকারমশাইও তাই পরামর্শ দিলেন, 'হারুর একটা পিণ্ড দিয়ে আসুন না গয়া গিয়ে। ওর আত্মাটার একটু বিশ্রাম তো দরকার। এত ছট-ফট করে ওর নিজের আত্মাটাই কষ্ট পাচ্ছে।'

চারুবাবু বললেন, 'এক বছর তো এখনো পূর্ণ হয় নি। ভাবছি এবারকার মহালয়ায় গয়া গিয়ে হারুর একটা শান্তির ব্যবস্থা করবো।' তারপর একটু ইতস্তত করে সরকারমশায়কে বন্ধু বিবেচনা করেই বললেন, 'তবে কথাটা বেশি উচ্চবাচ্য করবেন না। মার কানে যেন না যায়।'

কিছুটা বিস্মিত হলেন নরহরি সরকার। 'কেন? আপনার মা আপত্তি করবেন নাকি?'

চারুবাবু মাথা নেড়ে জানালেন, 'মা অবশ্যই আপত্তি করবেন। কোলের ছেলে মরে গেছে, সব শোক সহ্য করে মেনে নিয়েছেন। কিন্তু মরে গেলেও আছে, চোখে দেখতে পারছেন না কিন্তু মা বুঝতে পারছেন আছে। এটাই মার কাছে খুব বড় সান্ত্বনা। গয়ায় গিয়ে পিণ্ড দিলে তো হারু একদম হাওয়া হয়ে যাবে। মা এই বয়সে কি সেটা সহ্য করতে পারবেন?'

সমস্যাটার এই জটিল দিকটা সরকারমশায় ঘুণাক্ষরেও ভাবেন নি। শুধু সরকারমশায় কেন, হারুর ভৌতিকত্ব নিয়ে গত কয়েকমাস এ পাড়ায় যারা মাথা ঘামিয়েছে তারাও এ দিকটা ভেবে দেখেনি।

মায়ের স্নেহ উপেক্ষা করার জিনিস নয়। কিন্তু হারু আর হারুর ভূত কি এক হলো। তাছাড়া সবচেয়ে বড়কথা একটা জলজ্যান্ত ভূতের সঙ্গে ছেলেপুলে নিয়ে পাড়ার মধ্যে বসবাস করা; অবশ্য স্বীকার করা উচিত হারু এখন পর্যন্ত তেমন কিছু অঘটন ঘটায় নি কিন্তু হাজার হলেও ভূত তো, তার কখন কি মতিগতি হবে, তার কি কিছু ঠিক আছে।

আকাশপাতাল নানারকম চিন্তা করতে করতে সরকারমশায় চারু-বাবুকে ছেড়ে বাজারের দিকে এগোলেন। চারুবাবুও দ্রুত বাড়ির দিকে পা বাড়ালেন।

এরই মধ্যে বৈশাখ মাসের বেলা প্রখর হয়ে উঠেছে। তেঁতুলতলাটা

পেরোতেই চড়া রোদ। যাক, ছাতাটা ফেরত পাওয়া গেছে! সরকার মশায় ছাতাটা খুলে মাথায় দিতে গেলেন, কিন্তু ছাতাটা খুললো না।

ব্যাপারটা সরকারমশায়ের কেমন খটকা লাগলো। ভূতের কেড়ে নেওয়া ছাতা সেটা আর ব্যবহার করা উচিত হবে। কিন্তু হারু, অশরীরী হারু তারই বা ছাতার দরকারটা কি, তার কি রোদ-বৃষ্টিতে কোনো অসুবিধা হয়, সেই বা শুধু শুধু ছাতাটা কাড়তে গেলো কেন?

এই সব ভাবছেন অথচ মনের মধ্যে ভূতের ব্যাপারটার বিশেষ সায় মিলছে না। সে যা হোক, সরকারমশায় ঠিক করলেন, কালীবাড়ি থেকে শান্তিজল আর প্রসাদী ফুল নিয়ে এসে ছাতাটার ওপর ভালো করে ছিটিয়ে শোধন করে নিয়ে ব্যবহার করাই ঠিক। যদিও বিশ্বাস খুব একটা করেন না, তবু, সরকারমশায় ভাবলেন, আমি সংসারী মানুষ, কখন কিসে কি হয় কে জানে।

দুঃখের বিষয় কালীঘাটের ফুল-জল দিয়ে শোধন করে, এমন কি তুলসীপাতা ছিটিয়েও বন্ধ ছাতাটা খুললো না। অবশ্য ছাতাটার বাঁশের হাতলের মুখে একশো আটবার রাম নাম জপ করলেন সরকার গৃহিণী।

কিন্তু তাতেও ছাতা খোলা গেলো না। নট নড়ন চড়ন নট ফট।

অবশেষে কালীঘাট বাজারের সামনে বসে যে মুসলমান মিস্ত্রি তাকে দিলে সে খুলে দিলো। সে বললো, 'কলটা আটকে গিয়েছিলো। একদম মুচড়ে গেছে, পালটিয়ে নতুন কল নিতে হবে।'

সরকার মশায় আর কল পাল্টালেন না। প্রায় নতুন ছাতাটা প্রায় বিনা পয়সায় বেচে দিলেন ছাতার মিস্ত্রিটার কাছে, তাকে বললেন 'এটা তুমি নিয়ে আমাকে যা হয় দাম দাও, আমি একটা নতুন ছাতা কিনে নেবো।'

॥ পাঁচ ॥

আবার হারু

But the play being acted is not mine,
For this once let me go
But the order of the acts is planned
The end of the road already revealed.'

Boris Pasternak, Hamlet.

হিসেবমত এবার আমাদের উনিশশো চুরাশি সালে এবং আত্মারামের কাছে ফিরে যাওয়া উচিত। কিন্তু হারু ওরফে কাকাবাবুকে এই মুহূর্তে ছেড়ে আসা উচিত হবে না। তবে হারুর ভৌতিক জীবনে সত্তর বছরের দীর্ঘ কাহিনী লিখবার ইচ্ছা বা অবকাশ আমার নেই।

আর শেষ পর্যন্ত এমন কিই বা লিখবার আছে? হারুর ব্যাপার স্যাপার তেমন কিছু মজার বা গোলমেলে নয়, আর দশটা পাড়া বেপাড়ার ভূত যেমন হয় হারুও সেই রকমই।

কিন্তু হারুর একটা বদ দোষ দেখা দিয়েছিলো, যেটা নিয়ে অল্পবিস্তর আপত্তি-গোলমাল পাড়ার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে।

উনিশ বছর বয়েসের সদা যুবক খেলার মাঠে ফূর্তি করে এসে ঘুম করে মারা গিয়েছিলো। জীবনে তার অনেক দেখার বাকি ছিলো মৃত্যুর পরে হারুর স্বভাবে একটা বড় উশখুশ ভাব দেখা দিলো। রাতে বিরেতে এর ওর বাড়ির জানালা দিয়ে, দরজার ফাঁক দিয়ে, কখনো ভেন্টিলেটারের ঘুপচি দিয়ে গৃহস্থের ঘরের মধ্যে উঁকি দিতো সে।

হারুর অত্যাচারে পাড়ার লোকেদের প্রাইভেসি বলতে আর কিছু থাকলো না। যদিও ব্যাপারটা হারু নিশ্চয় সরলভাবেই করে যাচ্ছিলো। কিন্তু হারুর এই অনুপ্রবেশের প্রতিবাদে ধীরে ধীরে পাড়ার লোকেরা মুখর হয়ে উঠলো।

শিবকালী গেঁজেল অথবা সরকারমশায়ের প্রস্তাব কিঞ্চিৎ পাশ কাটিয়ে গেলেও পাড়ার লোকেরা যখন অনবরত, প্রায় প্রতিদিনই বলা

চলে, ভট্টাচার্য-বাড়িতে এসে হারুর বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাতে লাগলো, ভট্টাচার্য-বাড়ির লোকেরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠলো। গয়ায় গিয়ে বাৎসরিক শ্রাদ্ধ করে পিণ্ডদান করে আসবো এবারের প্রতিশ্রুতি দিয়েও প্রতিবেশীদের শান্ত রাখা গেলো না। পরশুদিন কাদের কলকাতায় নতুন বৌ গা ধুচ্ছিলো সন্ধ্যার পরে সেখানে নাকি হারু চৌবাচ্চার পিছনে লুকিয়েছিলো, নতুন বৌয়ের হাত থেকে সাবান কেড়ে নিয়েছিলো, হালদারের বাড়ির নয়মাসের বাচ্চাটাকেও হারু সেদিন রাতে তক্তপোষের উপর থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিতে গিয়েছিলো।

যেখানে যা হয়, কিছু ধরা বা বোঝা যায় না, হারুর নামে চলতে লাগলো। ব্রজেশ্বর মোক্তার রাত্রিবেলা মক্কেলদের সঙ্গে বসে পরদিনের একটা ফৌজদারি মালপত্র নথিপত্র ঘাঁটছিলেন। সেই সমস্ত দরকারি কাগজে কে যেন কালির দোয়াতটা উল্টে দিলো। এসব ছাড়া এ বাড়িতে, ওবাড়িতে ছোটোখাটো খাবার দাবার এমনকি মাছ-দুধ নিয়েও হারু নাকি টানাটানি শুরু করে দিলো।

এরই মধ্যে জগাই হালদারের বাড়ির বড় মেয়েটিকে সন্ধ্যাবেলায় জোরে একটা থাপ্পড় মারলো একজন, মেয়েই সিঁড়ি দিয়ে চোঁ-চা দৌড়ে ছাদে উঠে গেলো। মেয়েটির চেঁচামেচি শুনে সবাই দৌড়ে ছাদে গিয়ে দেখে কেউ কোথাও নেই, সব হাওয়া। এই ব্যাপারটা যে হারুই করেছে, এ বিষয়েও কারোরই কোনো সন্দেহ রইলো না।

কেউ কেউ আবার কোনো কোনো কাণ্ডে হারুর ওপর খুশিই হতো, যেমন ঐ জগাই হালদারের বাড়ির বড় মেয়েটিকে মারা, মেয়েটি তের-চোদ্দ বছর বয়েস হয়েছে, বাপ এখনো বিয়ে দিচ্ছে না। একটু বেলেল্লা ভাব দেখা যাচ্ছিলো স্বভাবচরিত্রে, হারুর থাপ্পড়টা এক্ষেত্রে কারো কারো পছন্দই হয়েছিলো।

কিন্তু তা হলেও পাড়াপ্রতিবেশীদের নানাধরনের অভিযোগ ও চাপে পড়ে হারুর বড়দা চারু ভট্টাচার্য মশায় পরের বছর কালিপুজোর সময় মেজো ভাই নারুকে সঙ্গে নিয়ে গয়ায় গিয়ে হারুর পারলৌকিক মুক্তির জন্যে যা কিছু করণীয় সম্ভব করে এলেন।

হারুর অত্যাচার এতে কমলো কিনা, সত্যিই হারু আগে অত্যাচার করতো কিনা, নাকি হারুর মার কথাবার্তা শুনে পাড়ার লোকে তার মৃত আত্মাকে কাল্পনিক প্রেতত্ব দান করে কিছু কিছু ঘটনার দায় তার উপরে চাপাতো, এতদিন পরে সে বিষয়ে বিশেষ কোনো আলোকপাত করা সম্ভব নয়।

যেমন ঢিমে তেতালায় চলছিলো তেমনই চলতে লাগলো কালীঘাট পাড়ার জীবন। দু একটা জন্ম মৃত্যু, বিয়ের শানাই, কোনো দিন মধ্য-রাত্রে মাতালের হল্লা, দুই গলির ছেলেদের মধ্যে ঢিল ছোঁড়াছুঁড়ি, দিন কেটে যেতে লাগলো। মহালয়ায়, কালীপুজোয়, পয়লা বৈশাখে কালী-মন্দিরে ভিড়, রথের মেলা, দুর্গাপুজো। দিন কেটে যেতে লাগলো। কলকাতা শহর একটু একটু করে ঢুকে যেতে লাগলো কালীঘাটের মধ্যে। কালীঘাট একটু একটু করে ঢুকে যেতে লাগলো কলকাতা শহরের মধ্যে। দিন কেটে যেতে লাগলো।

বছর তিনেকের মাথায় হারুর মা মারা গেলেন। সে বছরই প্রথম মহাযুদ্ধ লাগলো ইউরোপে। এত দূরে কলকাতা শহরেও সাজোসাজো রব। জিনিসপত্রের দাম হু হু করে বেড়ে গেলো। পাড়ার বখা ছেলেরা বাঙালী পল্টনে নাম লেখাবে বলে কেল্লার সামনে গিয়ে লাইন দিলো। হারু বেঁচে থাকলে হয়তো যেতো।

হারুর মা মরে যেতে হারুর কথা প্রত্যক্ষভাবে প্রায় সবাই ভুলেই গেলো। যে হারুর অত্যাচারে পাড়ার লোকেরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলো, এখন আর বিশেষ কেউ তাকে মনে করে না। তবে একটা কথা লোক-মুখে ছড়িয়ে আছে যে ভট্টাচার্য-বাড়িতে একটা পোষা ভূত আছে। সেই ভূতটা যে সেই বাড়িরই অকালমৃত ছোট ছেলে, যার নাম ছিলো হারু, সেটা বেশিদিন লোকে মনে রাখলো না। বছর আট দশেকের মাথায় হারুর পরিচয় এসে দাঁড়ালো জনৈক নির্বিবাদী ভূত হিসেবে। তখন আর লোকের দুধ মাছ চুরি গেলে, বাথরুমে নতুন বৌয়ের হাত থেকে সাবান পিছলে চৌবাচ্চায় পড়ে গেলে বা শিলনোড়া ভেঙ্গে গেলে হারুর ওপর দায়িত্ব চাপাতো না।

হারুর অস্তিত্ব প্রায় সর্বত্র বিলোপ হয়ে এসেছিলো। শুধু দু-এক জন পুরনো সঙ্গী আর প্রতিবেশী হারুর কথা সামান্য খেয়াল রেখেছিলো। আর একটা ব্যাপার ছিলো। হারুর মার মৃত্যুর বছর দুয়েকের মাথাতেই চারুবাবুও মারা গেলেন। তিনি মৃত ছোট ভাইয়ের প্রতি মমতাবশতই হোক বা অন্য কারণেই হোক বেলতলাটা লাল সিমেন্টে বাঁধিয়ে তার-মধ্যে একটা ছোট মত বাটির আকারে গর্ত করে দিয়েছিলেন হারুর খাবার দেওয়ার জন্যে। সন্ধ্যাবেলা এক চামচে দুধ হোক, এক টুকরো মাছ-হোক বাটির মধ্যে দিয়ে দেওয়া হতো। ওতেই হারুর হয়ে যেতো।

অবশ্য হারুর মা এবং তারপরে চারুবাবু মারা যাওয়ার পরে হারু নামটার আর কোনো মানে রইলো না। চারুবাবুর ছেলেমেয়েরা বেলতলায় খাবারের বাটিটাকে বলতো কাকাবাবুর বাটি। সন্ধ্যাবেলা ভট্টাচার্য-বাড়ির একতলার হেঁসেলের থেকে গিন্নি বা বৌ বলতো, 'এই যা কাকাবাবুর খাবার দিয়ে আয়।' সেই শুরু, সেই থেকে হারু পুরুষানুক্রমে ভট্টাচার্য-বাড়ির কাকাবাবু হয়ে গেলো। ছোট বড় সকলেরই, সব বয়েসের সব সম্পর্কের মেয়ে পুরুষের কাকাবাবু।

ধীরে ধীরে লোকেরা ভুলে গেলো কাকাবাবুর পরিচয়। শুধু বাড়ির সবাই জানতো এই বংশের এক পূর্বপুরুষ ভূত হয়ে বেঁচে রয়েছেন এই বাড়িতেই। তাঁর রক্ষণাবেক্ষণ, ভরণপোষণের দায়িত্ব ভট্টাচার্য বাড়ির লোকদের।

দিন কেটে যেতে লাগলো। কালীঘাটের দক্ষিণপুবে টালিগঞ্জ থেকে মনোহরপুকুরের মধ্যে গড়ে উঠলো ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের নতুন শহর বালিগঞ্জ। অনেক লোক সেখানে সস্তায় জমি কিনে পাড়া ছেড়ে উঠে গেলো। এদিকে পুরনো বাড়িগুলো ভেঙ্গে পড়ছে। তারই উঠোনের পাশে উঠছে নতুন দালান। তবে এ পাড়ায়, সেরকম বাড়ির সংখ্যা খুব কম। কালীঘাটের নতুনকালের বর্ধিষ্ণু পরিবারগুলি ছড়িয়ে পড়লো বালিগঞ্জের দিকে। শুধু কিছু পুরনো ভিটেমাটি জড়িয়ে থাকা লোক আর অজস্র অল্প আয়ের মানুষে ভরে গেলো পাড়া।

এপাশে ওপাশে দু-চারটে খানাখন্দ আর ডোবামতন ছিলো, এই সেদিনও পাড়ার বৌ-ঝিরা সেখানে বাসন মাজতে, কাপড় কাচতে যেতো। বর্ষাকালে ভরাডোবায় হয়তো দুএকটা ডুব দিয়ে স্নান সেরেও নিতো। সেসব কবে কেমন করে বুজে গেলো। উঠতে থাকলো দুএকটা ছোটখাটো বাড়ি। পুরনো বড় বাড়িগুলোর এদিকে ওদিকে ছড়ানো ছিটোনো খালিঘর গুলো ক্রমশ ভরে উঠলো পরবর্তী বংশধরদের দ্বারা আর নতুন ভাড়াটেতে।

এরই মধ্যে ছিটিয়ে ছিটকিয়ে দুচারজন পুরনো আমলের লোকও রয়ে গেলো। চেতলা হাটের গামছার দোকানদার কাকাবাবুর ইস্কুলের ক্লাস ফ্রেণ্ড গেঁজেল শিবকালী, কিসে কি হয়, থিয়েটারের কমিক পার্টে দারুণ নাম হলো তার। অনেক পরে সিনেমাতেও তার খ্যাতি হয়। হিজ মাস্টার্স ভয়েসের প্রথম যুগে শিবকালীর হাসির রেকর্ড, 'হারু কি চায়' লোকের ঘরে ঘরে বেজেছে, আনন্দ দিয়েছে। একটা মানুষ মরে গিয়েও আছে, খেতে পারছে না খাচ্ছে, দেখতে পারছে না দেখছে, হারু নামে এক বাল্যবন্ধুর বেঁচে না থেকে বেঁচে থাকার হাস্যকর প্রয়াস, চেতলাহাটের সেই গামছাওলা শিবকালী তার গেঁজেল অনুনাসিক কণ্ঠে হারুর মৃত্যুর বহু বছর পরে বাল্যবন্ধুর প্রেতাত্মাকে সে অমর করে দিয়ে গেলো।

তারও আগের কথা। সেটা উনিশশো একুশ সাল। সেটা অসহযোগের বছর। নরহরি সরকারমশায় সাহেব কোম্পানির দাসত্বের চাকরি ছেড়ে, কালীঘাটের ভাড়াটে বাড়ি ছেড়ে সংসারের সবাইকে নিয়ে দেশের বাড়িতে চলে গেলেন পূর্ববঙ্গের পাবনা জেলার এক গ্রামে। বঙ্গভঙ্গের আগের বছরে উনিশশো চার সালে তিনি এ পাড়ায় ভাড়াটে হয়ে এসেছিলেন। যদিও তাঁর দেশজ উচ্চারণভঙ্গি চিরদিনই তাঁর মেলামেশার একটা অন্তরায় হয়ে ছিলো, তিনি নানাভাবে এ পাড়ার সঙ্গে মিশে গিয়েছিলেন।

দেশে ফিরে যাওয়ার পরে, প্রায় পনেরো বছর পরে, আরেকবার এসেছিলেন সরকার মশায়। তখন বয়স হয়েছিলো তাঁর। সস্ত্রীক

কালীঘাট তীর্থ করতে এসেছিলেন। অনেক পালটে গেছে তখন সবকিছু। কালীঘাট পেরিয়ে বালিগঞ্জের নতুন রাস্তায় ট্রাম চলছে। ওপাশে ঝকঝকে নতুন রাস্তায় নতুন নতুন বাড়ি। পুরনো কালীঘাটের মত ঘিঞ্জি নয়, খোলামেলা। ছাদ খোলা ডবল ডেকার বাস হু হু করে বাতাস কেটে যাতায়াত করছে শ্যামবাজার কালীঘাটের মধ্যে।

শুধু কালীঘাটের পুরনো পাড়াটাই তেমন কিছু বদলায় নি। একটা নতুন সিনেমা হল উঠেছে বড় রাস্তায়। তারই পাশে তাঁর এক দূর সম্পর্কের ভায়রাভাইয়ের বাড়িতে উঠেছিলেন সরকারমশায়। সেখান থেকেই একদিন সকালে পুরনো পাড়ায় তিনি এলেন। দুচারজন চেনা লোক এখনো আছে। তবে কলকাতার মধ্যে এখন কালীঘাট পুরোপুরি ঢুকে গেছে, কলকাতার মানুষদের মতই এখানকার মানুষেরাও খুব ব্যস্ত।

দুচারটে খুব পুরনো বাড়ি প্রায় ধসে পড়েছে। বর্তমান বংশধরদের সেসব বাড়ি রক্ষণাবেক্ষণ করার ক্ষমতা নেই। এরই মধ্যে এর উঠোনের পাশে, ও বাড়ির পিছনের খিড়কির ফাঁকা চিলতে জায়গায় ছোটখাট নতুন একতলা-দোতলা বাড়িও উঠেছে অনেক। ভট্টাচার্য-বাড়ির সামনে এসে সরকার মশায় প্রায় চিনতেই পারলেন না। সামনের রোয়াকটা আর একতালা বাইরের ঘরটা নেই। সেখানে একটা নতুন বাড়ি প্রায় তৈরি শেষ। বাড়িটার সদরে মার্বেল পাথরে ফলক লাগানো 'মিত্রভবন'। তার মানে এ অংশটা ভট্টাচার্যরা বেচে দিয়েছে। হয়তো পিছনের দিকের অংশে এখনো ওরা আছে।

বাঁ পাশের পুরনো প্যাসেজ দিয়ে ভট্টাচার্য-বাড়ির ভিতরে একটু খোঁজ নিতে গেলেন সরকারমশায়। অনেকদিনের পুরনো চেনা পরিবার, কলকাতায় এসেছেন এতকাল পরে, দেখা করে একটু খোঁজখবর নেওয়া তো উচিত। প্যাসেজ দিয়ে ঢুকতে ঢুকতে সরকারমশায়ের হঠাৎ মনে পড়লো অনেকদিন আগে এই পথ দিয়েই এবাড়িতে ঢুকে হারুর কেড়ে নিয়ে যাওয়া ছাতাটা ফেরত নিয়ে গিয়েছিলেন।

সেদিনও ছিলো এমনি এক বৈশাখ মাসের সকালবেলা। এই রকমই গনগনে রোদ উঠেছিলো সেই সকালে। এবং তখুনি সরকার

মশায়ের মনে পড়লো গতকাল বিকেলের শেষাশেষি সত্যিই খুব কালবোশেখি ঝড় আর বৃষ্টি হয়েছিলো।

অনেকরকম ভাবতে ভাবতে ভট্টাচার্য বাড়ির উঠোনের মধ্যে ঢুকে গেলেন সরকারমশায়। এপাড়ার পুরনো লোক তিনি, কেউ না কেউ নিশ্চয়ই চিনবে। উঠোন দিয়ে একতলার বারান্দার কাছে দাঁড়িয়ে কেমন ফাঁকা ফাঁকা ন্যাড়া ন্যাড়া মনে হলো সরকারমশায়ের। তারপর খেয়াল হলো উঠোনের ঠিক মাঝখানে যে বেলগাছটা বহুকাল ছিলো সেটা আর নেই। বারান্দার মেঝে চারদিকের দেয়াল অনেক চটে গেছে। বিবর্ণ, পুরনো হয়ে গেছে বহুদিনের জীর্ণ কাঠের দরজা-জানালা।

কিন্তু কোথাও কেউ নেই। বাড়ির মধ্যে লোকজন কেউ আছে বলে মনে হচ্ছে না। এই সময় হঠাৎ সিঁড়ি দিয়ে দোতলা থেকে কে যেন নেমে এলো।

দিনের আলোয় স্পষ্ট চোখে ভূত দেখলেন সরকার মশায়, সিঁড়ি দিয়ে হারু নেমে আসছে। অন্তত পনেরো বছর আগে মারা গেছে ছোকরা, কিন্তু মুখ-চোখ, বয়েস-চেহারা সবকিছু মিলিয়ে পলকের মধ্যে বুঝতে পারলেন সরকার মশায়, এ সেই বখা হারু যে খালপাড়ে তাঁর ভাগ্নেকে বিড়ি খাওয়া শেখাচ্ছিলো।

নরহরি সরকার স্বদেশী করা, খদ্দর পরা লোক। ভূত দেখে বিশ্বাস করার লোক তিনি নন। কিন্তু ঐ দোতলার সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছে পনেরো বছর আগের মরে যাওয়া মানুষ, যাকে কেওড়াতলা শ্মশানে নিজের চোখে তিনি পুড়তে দেখেছেন।

স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন সরকার মশায়। 'সর্বনাশ! হারু তো আজো ছাড়ে নি।' চকিতে চিন্তা করে সরকারমশায় দ্রুতগতিতে পশ্চাদপসরণ করলেন। হারু তখন সিঁড়ি দিয়ে নেমে প্যাসেজ পর্যন্ত চলে এসেছে।

তাড়াতাড়ি ছুটে রাস্তায় নেমে ভট্টাচার্য বাড়ির সামনের দিকে একবার মাথা ফিরিয়ে তাকালেন সরকারমশায়।

কি সাংঘাতিক কাণ্ড! কলকাতা শহরে দিনে দিনে কি অবস্থা

দাঁড়িয়েছে। একেবারে রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছে, কেমন যেন অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে সরকার মশায়ের দিকে। প্রাকাশ্য দিবালোকে কলকাতার রাস্তায় ভূত। আর একবার পিছন দিকে তাকালেন সরকার মশায়, ভট্টাচার্যদের বাড়ির বাইরের ফুটপাথে এখন আর কেউ নেই। হারু মিলিয়ে গেছে।

একটু সম্বিত পেতে সরকারমশায়ের খেয়াল হল রোদটা বড় টনটনে আর এ জায়গাটায় রোদটা বড় বেশি মাত্রায় রয়েছে বলে মনে হচ্ছে।

সেই মুহূর্তে সরকারমশায়ের খেয়াল হলো, এখানে ঐ মোড়ের মাথায় সে বিশাল বহুকালের পুরনো তেঁতুলগাছটা ছিলো, সেটা নেই। কবে ঝড়েটড়ে পড়ে গেছে বোধহয়, না হয় কর্পোরেশনের লোকেরা কেটে ফেলেছে। তাই জায়গাটা এত ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। পুরো এলাকাটাই ফাঁকা ফাঁকা হয়ে গেছে।

রোদের জন্যে হাতের ছাতাটা খুলে মাথায় দিতে গেলেন সরকার মশায়। কিন্তু ছাতাটা এবারো খুললো না।

'তাহলে, এবারো হয়তো ছাতাটার জন্যেই হারু তাড়া করে এসেছিলো, তাড়াতড়ি পা চালিয়ে ট্রাম রাস্তায় দিকে এগোতে এগোতে সরকার মশায় ভাবলেন। বড় রাস্তায় উঠে আসতেই শুনতে পেলেন, রাস্তার পাশের একটা গ্রামোফোনের দোকানে তখন শিবকালীর কমিক রেকর্ড 'হারু কি চায়' বাজছে। চোঙার চারপাশে কয়েকজন লোক দাঁড়িয়ে সেটা শুনে হো হো করে হাসছে।

দেশে থাকতেই সিরাজগঞ্জে এক উকিলবাবুর বাড়িতে সরকারমশায় শিবকালীর রেকর্ডখানা শুনেছিলেন। তাঁর খুব হাসি পায়নি অবশ্য, কাউকে তেমন কিছু বলেন নি। হারুর ব্যাপারটা যে তাঁরও জানা, শিবকালীকেও বেশ চিনতেন, এসব কথা কাউকে বলেন নি।

এখন রাস্তার এই দোকানে লোকদের 'হারু কি চায়' রেকর্ড শুনে এতো হাসতে দেখে, সরকার মশায়ের কেমন চিন্তা হলো। এরা কি জানে হারু কে, এরা কি জানে হারু এখনো আছে, এদের খুব কাছেই আছে?

॥ ছয় ॥

মনোরমা, মনোরমা

'আর যদি নাই আসো · ফুটন্ত জলের নভোচারী
বাষ্পের সহিত যদি বাতাসের মতো নাই মেশো
সেও এক অভিজ্ঞতা,'

বিনয় মজুমদার, আমার ঈশ্বরী।

আত্মারাম সেকেণ্ড ইয়ারে পড়ার সময় কলেজ ম্যাগাজিনের সহকারী সম্পাদক হয়েছিল। তার উপরে ভার ছিল কিছু প্রাক্তন ছাত্রের লেখা সংগ্রহ করার। বাংলার অধ্যাপক পরমেশবাবু তাকে বলেছিলেন যোগব্রত চক্রবর্তীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে। যোগব্রত ওদের কলেজেরই প্রাক্তন ছাত্র আর তা ছাড়া অন্যান্য পুরনো ছাত্রদের সঙ্গেও তার খুব মেলামেশা রয়েছে।

অনেক কষ্টে ঠিকানা যোগাড় করে বেহালার অভ্যন্তরে এক গভীর গলির মধ্যে একদিন মনোরমাকে সঙ্গে নিয়ে সে যোগব্রত চক্রবর্তীর বাসায় পৌঁছালো। রবিবারের সকাল বেলা, তখন প্রায় সাড়ে দশটা। যোগব্রতর মা রান্নাঘরে কি রান্না করছিলেন। ওদের বাড়ির মধ্যে ঢুকতে দেখে এগিয়ে এসে দাঁড়াতেই আত্মারাম বললো, 'আমরা যোগব্রত চক্রবর্তীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।' যোগব্রতর মা বললেন 'এই তো কয়েকঘণ্টা আগে রাত কাবার করে খোকন বাড়ি ফিরল। এখন তো ঘুমুচ্ছে।'

হঠাৎ এরই মধ্যে ঘুম থেকে উঠে চোখ কচলাতে কচলাতে যোগব্রত সামনের ঘরটার মধ্যে থেকে বেরিয়ে এল, 'কে রে? কাকে খুঁজছিস আমাকে?'

প্রথম দর্শনেই যোগব্রতকে দেখে অভিভূত হয়ে গেল মনোরমা দেবশিশুর মতো চেহারা, যীশু খ্রীস্ট যদি বাঙালী হতেন নিশ্চয় এইরকম দেখতে হতেন। একমাথা এলোমেলো চুল, একগাল অবিন্যস্ত দাড়ি, পাকা গমের মতো গায়ের রঙ, মন্দ্র কণ্ঠ, মায়াময় দৃষ্টি যেন কোনো

রোমান্টিক উপন্যাস থেকে মলাট ছিঁড়ে বেরিয়ে এসেছে; মনোরমা সাবেকি কুলীন কায়স্থ বংশের কন্যা, সুদর্শন পুরুষ সে আত্মীয় স্বজনের মধ্যে অনেক দেখেছে, রাস্তাঘাটে, কলেজেও দেখেছে, তবু যোগব্রতকে দেখে সে মুগ্ধ হয়ে গেল।

কাঁচা ঘুম থেকে উঠে কিঞ্চিৎ ধাতস্থ হওয়ার পরে যোগব্রত ওদের জিজ্ঞাসা করল, 'কি চাই।' আত্মারাম বললো, 'আমরা আশুতোষ কলেজ থেকে এসেছি। বার্ষিক ম্যাগাজিনের জন্য কবিতা নিতে।' যোগব্রত এবার মনোরমার দিকে তাকিয়ে আত্মারামকে জিজ্ঞাসা করলো, 'আশুতোষ কলেজ কি এর মধ্যে কো-এডুকেশন হয়ে গেছে নাকি?'

এই প্রশ্নে আত্মারাম এবং মনোরমা উভয়েই কেমন বিব্রত ও সঙ্কুচিত হলো। আত্মারাম একটু গুছিয়ে নিয়ে বলল, 'না, তা নয়। ও হলো মনোরমা মিত্র। ও পড়ে যোগমায়াতে। আর আমার নাম আত্মারাম ভট্টাচার্য আমি আশুতোষ কলেজ ম্যাগাজিনের সহকারী সম্পাদক। এক পাড়ার মেয়ে, আপনার কাছে আমার সঙ্গে এমনিই এসেছে। একা যাবো, তাই ওকে সঙ্গে করে এলাম।'

যোগব্রত ভ্রূ কোঁচকালো, 'এমনিই এসেছে। সঙ্গে করে এলাম। এগুলো একটা কথা হলো। কি দিনকাল পড়েছে বাবা!'

কিছুক্ষণ ধরে অনর্গল কথা হলো যোগব্রতর সঙ্গে আত্মারামের। মনোরমা চুপচাপ বসে হাতের কড়ে আঙুলে শাড়ির একটা প্রান্ত একবার করে জড়িয়ে একবার করে খুলে সময় কাটাতে লাগলো। কবিতা, সাহিত্য, পত্রিকা, লেখা ছাপা, নানা রকম বিষয় নিয়ে কথার পর যোগব্রত জিজ্ঞাসা করলো, 'তুমি থাক কোথায়?' আত্মারাম বাড়ির ঠিকানা বলতে যোগব্রত বলল, 'আরে তাই বলো। তুমিতো তারাপদদার বাড়ির উল্টোদিকে থাকো। তারাপদদাকে চেনো?'

আত্মারাম বললো, 'মুখ চিনি। উনি তো এ বাড়িতে শুধু রবিবার থাকেন। সারা সপ্তাহ ধরে বাইরে কোথায় থাকেন। ওঁর দাদা থাকেন এ বাড়িতে। তবে তাঁর মাথা খারাপ।' তারপর একটু ইতস্তত করে আত্মারাম বললো, 'তারাপদদার সঙ্গে আলাপ করার ইচ্ছা আছে।

খুব সাহস হয় নি। জোরে জোরে হাঁটেন, ধমকের গলায় কথা বলেন।' হঠাৎ মনোরমা এর মধ্যে যোগ করলো, 'ও পাড়ার লোকেরা ওঁর নাম দিয়েছে ভোম্বল দাস।'

এ কথা শুনে যোগব্রত হো হো করে হাসতে লাগলো, 'তারা-পদদার নাম দিয়েছে ভোম্বল দাস! তারাপদদা জানে কি?'

অনেক কথাবার্তার পর দু-কাপ চা খেয়ে আত্মারাম আর মনোরমা উঠলো, ওঠার সময় যোগব্রত ওদের বললো, 'তোমাদের এক রবিবারে তারাপদদার বাড়িতে নিয়ে যাবো। সেখানে গেলে শংকরদা, সুনীলদা, শক্তিদা, শরৎদা এদের সঙ্গে আলাপ হবে।'

আত্মারাম বললো, 'শংকরদার সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে, শংকরদার বাড়িতেও গেছি। আর একদিন রাতে তারাপদদার বাড়ির সামনে শক্তিদার রিক্সাওয়ালার ভাড়া আমি আর আমার এক বন্ধু দিয়ে দিয়েছিলাম।'

সাহিত্যের লাইনে খুব বেশি হাঁটাহাঁটি করা হয় নি শেষ পর্যন্ত। আত্মারাম নিজে থেকে পিছিয়ে গিয়েছিল। দু-চারবার দু-একটা পত্রিকায় কবিতা-টবিতা দিতে গেছে, সুতৃপ্তি রেস্টুরেণ্ট বা কফি-হাউসেও গিয়েছে কিন্তু নিজেকে সে মেলাতে পারেনি সাহিত্যের আড্ডায়। সবসময়েই নিজেকে কেমন বহিরাগত মনে হয়েছে তার।

কথায় কথায় মনোরমা একবার বলেছিলো, 'এই লোকগুলো একটু গোলমেলে। নিজেদের মধ্যে একরকম গলায়, একরকম ভাষায় কথা বলে। আবার বাইরের লোকের সঙ্গে আরেক রকম।' আত্মারাম অবশ্য আপত্তি করেছিল, 'সবাই তাই। তুমি আমার সঙ্গে যেভাবে কথা বলো, অন্য সকলের সঙ্গে সে ভাবে কথা বলো নাকি?'

আত্মারাম আর মনোরমা টাইগার সিনেমায় সন্ধ্যার শো-তে 'কাম সেপ্টেম্বর' দেখতে এসে ফিরে যাচ্ছিলো। পুরনো বই, তবু কি ভিড়, টিকিট পাওয়া গেলো না। এটা তখন তাদের সেই বয়েস যখন কিছু না পেলেও মন খারাপ হয় না। চৌরঙ্গী রোড দিয়ে দুজনে হেঁটে দক্ষিণের দিকে আসছিল এলোমেলো কথা বলতে বলতে। মধ্যে মধ্যে মনোরমা

দু-বছর আগে প্রথমবার দেখা 'কাম সেপ্টেম্বরের' সেই মায়াবি গানের একটা পংক্তি গুনগুন করছিলো।

শীতের সন্ধ্যা, ছুটির দিনের শেষ। রাস্তায় লোকজন, আলো। কলকাতাকে খুব উচ্ছল, উজ্জ্বল মনে হচ্ছে। হঠাৎ পার্ক স্ট্রীটের মোড়ে মনোরমা আত্মারামকে একটা খোঁচা দিয়ে বললো, 'ঐ ছাখো।'

সায়াহ্নের ঘন ট্রাফিকে দ্রুতগতি ট্রাম, বাস, লরি, ট্যাক্সি, গাড়ি সব কিছু উপেক্ষা করে ময়লা নীল হাফ শার্ট গায়ে দুটো হাত পাখির উড়ন্ত ডানার মতো দুপাশে ছড়ানো, টলমল পায়ে এক ছন্নছাড়া যুবক গান্ধী মূর্তির নিচের দিক থেকে কোনাকুনিভাবে হল অ্যাণ্ড অ্যাণ্ডারসনের দিকে হেঁটে আসছে। মনে হচ্ছে যেন ভেসে চলেছে। গাড়ির হর্ন, ট্রাফিক, পুলিসের চিৎকার, হুইসিল ; একটা ট্রাক দক্ষিণ দিক থেকে ফুল স্পীডে আসছিলো, দেখতে পায়নি, শেষ মুহূর্তে ক্যাঁচ করে থেমে গেলো কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই যুবকের। মনোবমা আত্মারামকে ফিসফিস করে বললো, 'কবি তুষার রায়। ডেথ-ডেথ খেলছেন।' আগের শনিবার দিনই ময়দানে মুক্তমেলায় সে বান্ধবীদের সঙ্গে গিয়েছিলো, সেখানে তুষার রায়কে দেখেছে, নিতান্ত অবহেলাভরে সেদিন তুষার এক জাঁদরেল পুলিস অফিসারকে বলেছিলো, 'ওরে ও ভাই পুলিস, আমাকে দেখে টুপিটা তোর একটু খানি খুলিস।'

পার্ক স্ট্রীটের ডানদিকের ফুটপাথে উঠে শীতের সন্ধ্যার নীল কুয়াশা আর আকাশি নিয়ন দ্যুতির মধ্যে কিছুক্ষণের মধ্যেই মিলিয়ে গেলেন তুষার রায়।

এই রকম সব তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনা এখনো আত্মারামের মনে পড়ে। এখনো মনে পড়ে মনোরমাকে।

মনোরমার সঙ্গে আর কখনো দেখা হবে না এ ব্যাপারটা বুঝতে তার দু-তিন বছর লেগেছিলো। প্রথমে ভাবতো হয়তো মনোরমা কাজেকর্মে কলকাতায় আসবে। তার সঙ্গে দেখা করবে। কোনোদিন দুপুরবেলায় দরজায় কড়া নাড়া শুনে ঘুম থেকে উঠে তাদের জীর্ণ ভট্টচার্য-বাড়ির

মলিন কপাট খুলে সে দেখবে মনোরমা দাঁড়িয়ে আছে।

মনোরমা এলো না, চিঠিও দিলো না। কিন্তু সেও তো একটা খোঁজ নিতে পারতো, একবার খড়্গাপুর গিয়ে খুঁজে বার করতে পারতো মনোরমাকে।

একেবারে যে চেষ্টা করে নি আত্মারাম তা অবশ্য নয়। একবার পুরী গিয়েছিলো, যাওয়ার সময় রাত প্রায় সাড়ে দশটার সময় পুরীর ট্রেনটা খড়্গাপুরে দাঁড়াল, সমস্ত প্লাটফর্ম রেলের কামরার জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে তাকিয়ে তন্নতন্ন করে খুঁজলো সে, হঠাৎ মনোরমা আসতেও তো পারে প্লাটফর্মে। তারপর ট্রেন যখন ছাড়লো, আলো অন্ধকারে মেশানো খড়্গাপুর শহরের এ পাশ থেকে ওপাশ চোখ দিয়ে খুঁজলো সে, কোনো আলোকিত অলিন্দে মনোরমা হয়তো দাঁড়িয়ে থাকতেও পারে।

মনোরমার কথা আপাতত থাক।

মনোরমা কতটা দুঃখী তা আমরা জানি না। তবু বলবো ভট্টাচার্য বাড়ির দুঃখের সংসারের দরজায় মনোরমা না এসে হয়তো ভালই করেছে। যদি সে সত্যিই কোনদিন আসে তখন না হয় দেখা যাবে।

এতক্ষণ আপনারা নানা কায়দা করে কঠিন বাস্তবকে এড়িয়ে গেছেন। আত্মারামের সংসারের মধ্যে প্রবেশ করতে চান নি। আসুন এবার সেখানে যাই। কি ছিরি সেই সংসারের! কি ছাঁদ!!

শ্রীহীন, ছন্দহীন সেই ভট্টাচার্য-বাড়ির গল্প আর দশটি ভেঙ্গে পড়া সংসারের চেয়ে আলাদা নয়। নতুন করে সে গল্প লেখার কিছু নেই। আপনারা নিজেরাই কেউ কেউ এসেছেন সেরকম বাড়ি থেকে, আর কেউ কেউ পাশের বাড়ি বা উল্টো দিকের দোতলার জানলা থেকে দেখেছেন ফাটা দেয়ালে গর্তে অশ্বত্থের চারা বড় হচ্ছে, ঝুরঝুর করে ঝরে পড়ছে গত শতাব্দীর চুনবালী জড়ানো পলেস্তারা।

তবু গল্প বলার খাতিরেই ছোট করে একটু বলে রাখি। নদীয়া জেলার যে চৌবেড়ে গ্রামে নীল দর্পণের নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের জন্মভার থেকে কয়েক ক্রোশ দূরে কণ্ঠপুর মৌজায় ভট্টাচার্যদের বহুকালের-

-পুরনো বসবাস ছিলো। কিন্তু বৎসরের পর বৎসব উপর্যুপরি খরায় ও বন্যায় এ অঞ্চল বসবাসের অযোগ্য হয়ে ওঠে। বায়বাহাদুর দীনবন্ধু মিত্র ইংরেজ সরকারের ডাক বিভাগে বড় চাকরি করতেন। গ্রাম-সুবাদে আত্মারামের পিতামহের পিতামহ রামনারায়ণ ভট্টাচার্যকে তিনি চিনতেন এবং ব্রাহ্মণ পবিবাবটির আর্থিক দুর্দশার কথা বিবেচনা করে তিনি রামনারায়ণকে কলকাতাব বড় ডাকঘরে একটি কাজ যোগাড় করে দেন।

দীনবন্ধুব চেয়ে রামনারায়ণ বয়সে অনেক ছোটো ছিলেন এবং দীনবন্ধু মিত্রের মৃত্যুর পরেও বহুবছব ডাক বিভাগে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন পদে অত্যন্ত যোগ্যতাব সঙ্গে কাজ করেন। আলিপুরে যখন প্রথম বড় জেলা সদব পোস্টঅফিস আলাদা করা হলো তখন তিনিই তার প্রথম পোস্ট মাস্টার নিযুক্ত হন এবং সেই সময়ে কণ্ঠপুরগ্রামের পাট সম্পূর্ণ উঠিয়ে দিয়ে কালীঘাটে বসবাস শুরু করেন। সরকাবি চাকরির আয়ে কোনো বকমে কালী মন্দিরের কাছেই ছোট দোতলা বাড়িটি তৈরি করেন। তাব আগে কাছেই ভাড়া বাড়িতেই থাকতেন।

রামনারায়ণই কলকাতা এলাকায় ভট্টাচার্য-বাড়িব মূল প্রতিষ্ঠাতা, যেমন মোগল সাম্রাজ্যের বাবর। রামনারায়ণেব ছেলে চারু ভট্টাচার্য, চারুপদ ভট্টাচার্য, আত্মাবামেব প্রপিতামহ। তারই ভাই হারু, ভট্টাচার্য-বাড়িব ভূত, পুরুষানুক্রমে কাকাবাবু। চারু ভট্টাচার্য থেকে আত্মারাম পর্যন্ত এই চারপুরুষেব দীর্ঘ ফিরিস্তি দিয়ে এ কাহিনী ভাবাক্রান্ত করাব প্রয়োজন নেই। শুধু আত্মাবামেব সম্মান রক্ষার জন্যে লিখে বাখা উচিত ভট্টাচার্য-বাড়িব কখনোই খুব জমজমাট বা বর্ধিষ্ণু ভাব ছিলো না, আত্মারামেব আমলেই যে তার সমূহ পতন হয়েছে তা নয়।

দু-চারটে ছেলেমেয়ে, ছোটখাট বা মাঝারি একটা চাকরি, পাঁচ দশ বছব পর একটা বাড়িব চুনকাম বা ছোটখাটো সংস্কার ; কখনো একটা বিয়ে, একটা অন্নপ্রাশন, একটা শ্রাদ্ধ, কখনো দু-চারজন আত্মীয় কুটুম্ব। বছরের শেষে ভট্টাচার্য বাড়ির উঠোনের একমাত্র বেলগাছ কচিপাতায় ছেয়ে গেছে, ফলভারে নুয়ে পড়েছে। মোড়ের মাথায় প্রাচীন তেঁতুল

গাছে টিয়া পাখিরা যথাসময়ে চেঁচামেচি করতে করতে সার বেঁধে ফিরে এসেছে। আত্মারামের বাপঠাকুরদারা যথারীতি জন্মেছে, বড় হয়েছে, কষ্টেসৃষ্টে জীবিকা অর্জন করেছে অবশেষে আগে পরে সময়ে অসময়ে মারা গেছে। সুখে-দুঃখে আনন্দে-বিষাদে কেটে গেছে দিন।

শুধু কাকাবাবু ব্যতিক্রম। তাঁর সুখ নেই, দুঃখ নেই, আনন্দ নেই, বিষাদ নেই; জরাহীন, মৃত্যুহীন এক প্রেতাত্মা। পৌনে শতাব্দী পার হয়ে গেলো, তাঁর পূর্বপরিচয় আজ আর কেউ চেষ্টা করলেও স্মরণ করতে পারবে না।

উঠোনের বেলগাছ, যার তলায় বাঁধানো সিমেন্টের বাটিতে তাঁর খাবার দেওয়া হতো, সেই বেলগাছও বহুদিন হলো নিশ্চিহ্ন হয়েছে। আত্মারাম জন্মানোর সময় পর্যন্ত ছিল না। তবে আত্মারাম বাঁধানো বেদীটা দেখেছে যার মধ্যে কাকাবাবুর বাটিটা ছিল। ছোটোবেলায় আত্মারাম কতবার সন্ধ্যাবেলা রান্নাঘর থেকে মা কিংবা ঠাকুমার কাছ থেকে কোনো এক টুকরো খাবার নিয়ে ঐ বাটির মধ্যে রেখে দিয়েছে।

কাকাবাবুকে খাবার দেয়ার রীতি হলো সন্ধ্যার দিকে। আত্মারাম দেখেছে অনেক সন্ধ্যায় কাকাবাবুর খাবার ইঁদুরে বা পিঁপড়েয় খেয়ে গেছে। কাকাবাবু লোকজনের মাঝখানে খেতে আসেন নি। একবার ভোরবেলাতেও কি কারণে ঘুম থেকে উঠে আত্মারাম দেখেছিল একটা কাক বাসি খাবারটুকু খাচ্ছে। কেন যে রাতে কাকাবাবু খেয়ে নেন নি।

আত্মারামের দশ বছর বয়সে বাবা মারা গেছেন। তখন তার পিতামহ আর পিতামহী বেঁচে। রামনারায়ণ ভট্টাচার্যের আমল থেকেই এ বাড়িতে অন্তত একজনের পোস্টাফিসে একটা চাকরি বাঁধা ছিলো। সে আমলে ডাক বিভাগের চাকরিতে পারিবারিক সততার উপর খুব গুরুত্ব দেওয়া হতো। পারিবারিক সূত্রেই পুরুষানুক্রমে এ বাড়ির লোকেরা ডাক বিভাগে কাজ করে এসেছে। আত্মারামের বাবাও তাই করেছিলেন। কলকাতার জেনারেল পোস্ট অফিসের সদর দপ্তরে তিনি কাজ করছেন। তখন তাঁর অল্প বয়স, বড়জোড় চল্লিশ, মাত্র কয়েকমাস আগে তিনি কালীঘাট পোস্টাফিস থেকে জি পি ও-তে এসেছেন। অফিস ছুটির

পর জি পি ও-র সামনেই রাস্তা পেরিয়ে ট্রাম ধরতে ওপারে আসার সময় হঠাৎ কয়লাঘাটের দিক থেকে দ্রুত গতিতে চলে আসা একটা লরির নিচে তিনি চাপা পড়েন। সাঙ্ঘাতিক আহত অবস্থায় কয়েক-দিন মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে তিনি বেঁচে ছিলেন।

সেই সময় মা, ঠাকুর্দা, ঠাকুরমার সঙ্গে প্রায় প্রতিদিন আত্মারাম কালীঘাট থেকে ধর্মতলা এসে ট্রাম বদল করে কলেজ স্ট্রিটে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে বাবাকে দেখতে যেতো বাবার কথা ভালোই মনে আছে আত্মারামের, তবে তার চেয়ে অনেক বেশি করে তার হাস-পাতালের কথা মনে আছে। ডেটল-ফিনাইল মেশান হাসপাতালের রুগ্ন-গন্ধ, পাশাপাশি লোহার খাটে পরপর রোগী। কয়েকদিন মাত্র কষ্ট পেয়েই তার বাবা মারা গিয়েছিলেন। এর পরে আর কখনো হাসপাতালে যেতে হয় নি আত্মারামকে। যাওয়ার খুব ইচ্ছেও নেই তার। এখনো অনেক সময় আনমনে একা একা হাসপাতালের সেই রুগ্ন-গন্ধ তার নাকে ফিরে আসে, কি রকম অসুস্থ মনে হয় তার; তার মনে পড়ে সারি সারি লোহার খাটে ঘর ভর্তি রোগী। কারো মাথায় ব্যাণ্ডেজ, কারো হাতে প্লাস্টার, কারো পা সামনের দিকে টানা দিয়ে আটকানো। দমবন্ধ করা স্মৃতি। দু-একবার স্বপ্নেও এই দৃশ্য আত্মা-রামের কাছে ফিরে এসেছে।

আত্মারামের বাবা মারা যাওয়ার পর অফিসের লোকেরা এসে বলেছিলো চেষ্টা করলে আত্মারামের মার জন্য একটা কাজ পোস্টাফিসে যোগাড় হতে পারে। বড় সাহেবের কাছে একটা দরখাস্ত করতে হবে, তা হলেই হয়তো হয়ে যাবে। আত্মারামের মার এ ব্যাপারে খুব আপত্তি ছিলো না, তিনি নিজে ম্যাট্রিক পাশও ছিলেন। কিন্তু শ্বশুর মশায়ের আপত্তিতে তাঁর আর কাজের চেষ্টা করা হয় নি।

আত্মারামের বাবার আরো দুই ভাই ছিলো। কিন্তু একজনের বয়েস যখন এগারো, আরেকজনের নয়, সেই সময় এক বর্ষার দিনে কালীঘাটের আদিগঙ্গায় দুই ভাই স্নান করতে গিয়ে একসঙ্গে ডুবে মারা যায়। বোধ হয় ছোট ভাই পিছল ঘাটে হড়কিয়ে আগে জলে ডুবে

যায়, বড় ভাই তাকে বাঁচাতে গিয়ে দুই জনেই জড়াজড়ি করে ডুবে মারা যায়।

আত্মারামের এক পিসিও ছিলো। বাগবাজারে বিয়ে হয়েছিল। খুব আবছা আবছা তাকে মনে আছে আত্মারামের। আত্মারামের যখন বছর দুয়েক বয়েস তখন তার বিয়ে হয়ে যায়। তার আগে পর্যন্ত আত্মারাম অধিকাংশ সময় তার কোলেই থেকেছে। সেই পিসিও বিয়ের পরের বছরই বাচ্চা হতে গিয়ে মারা গেলো। সেই শোকটা শিশু আত্মারামের খুব লাগে নি, কিন্তু পিসির জন্যে এখনো তার কেমন একটা মায়া হয়। সামনের বারান্দায় প্রতিদিন মা পিসিকে তারপর পিসি মাকে চুল বেঁধে দিতো, খুবই শৈশবের স্মৃতি, কিন্তু কেমন যেন কেমন করে মনে রয়ে গেছে।

আত্মারামের ঠাকুর্দা, ঠাকুমা দুজনেই অনেক শোক পেয়েছিলেন জীবনে। আত্মারামের বাবার মৃত্যুর পরে তাঁরা ভেঙে পড়লেন, বুড়ো-বুড়ির বুড়ি বছর খানেকের মাথায় মারা গেলেন, ঠাকুর্দা আরও চার-পাঁচ বছর বেঁচে ছিলেন।

সুখের বিষয় আত্মারামের নিজের ভাইবোন কেউ ছিলো না। আত্মারাম এ নিয়ে ভেবেছে, তা হলে তাকেও অনেক শোক পেতে হতো। আত্মারামের আরো একটা ক্ষীণ ধারণা ছিলো এবং এখনো আছে যে বাবা-কাকাদের মতো সেও একদিন বেঘোরে দুর্ঘটনায় মারা পড়বে।

এইখানে আত্মারামদের বাড়ির কথা তাড়াতাড়ি শেষ করার আগে একটা কথা লিখে না রাখলে অন্যায় হবে।

পনেরো বছর আগে মৃত হারুকে সিঁড়ি দিয়ে নামতে দেখে সেই যে সরকার মশায় একদিন সকালে ভট্টাচার্য বাড়ি থেকে ছুটে পালিয়ে গিয়েছিলেন, যে হারু তাকে প্যাসেজ দিয়ে রাস্তা পর্যন্ত তাড়া করে-ছিলো সে কিন্তু হারু বা কাকাবাবু নয়। সেদিন সকালবেলা, ভট্টাচার্য বাড়ির সকলে গিয়েছিলো কি একটা উপলক্ষে কালী মন্দিরে পুজো দিতে। বাড়িতে একা আত্মারামের বাবা ছিলেন দোতলায়। তখন তাঁর আঠারো-উনিশ বছর বয়েস, তিনিই সরকার মশায়ের পায়ের শব্দ

শুনে দোতলা থেকে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসেছিলেন, পরে সরকার মশায়কে তাড়াতাড়ি চলে যেতে দেখে প্যাসেজ দিয়ে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন।

আত্মারামের বাবার অল্প বয়েসেই নরহরি সরকার এ পাড়া ছেড়ে চলে যান, সরকার মশায়কে তাঁর চেনা ছিলো না। কিন্তু সরকার মশায় ভট্টাচার্য-বাড়ির অন্য প্রজন্মের আঠারো বছরের জীবিত যুবককে দেখে, যার সঙ্গে ঐ বয়সে মৃত হারুর আদলের যথেষ্ট মিল থাকা স্বাভাবিক, ভূত বলে ভয় পেয়েছিলেন।

আত্মারামের মা মারা গেলেন তার বি এ পরীক্ষার রেজাল্ট বেরোনোর মাস দুয়েক পরে। আত্মারামের বাবা মারা যাওয়ার সময়ে আত্মারামের উপনয়ন হয় নি। একমাত্র ছেলের উপনয়ন ভালোভাবে ঘটা করে দেওয়ার ইচ্ছা ছিলো আত্মারামের মা-বাবার। পরের বৈশাখে একটা তারিখও মনে মনে ঠিক করা হয়েছিলো। কিন্তু তার প্রয়োজন হলো না, ঐ বাবার শ্রাদ্ধের দিনেই তাকে উপনয়ন সংস্কার করিয়ে গলায় পৈতে দিয়ে তারপর বাবার শ্রাদ্ধ করানো হলো।

মায়ের মৃত্যুর পরে হাসপাতাল থেকে কয়েকজন বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে মাকে নিয়ে কেওড়াতলায় পুড়িয়ে সে ঠিক করেছিল এবার কেটে পড়বে এই শহর থেকে। অন্য কোথায় গিয়ে নতুন করে জীবনের সন্ধান করবে।

কিন্তু তা হয়ে ওঠে নি। তার জন্যে কিছুটা দায়ী কাকাবাবু আর অনেকটাই মনোরমা।

আগে মনোরমার কথা এতটা ভাবত না। উচিত ছিলো যত দিন যাবে, মনোরমা মন থেকে মুছে যাবে। কিন্তু তা হয় নি। মনোরমা তাদের এ বাড়িতে কখনো আসে নি বটে তবে বাড়িটা ভালভাবেই চিনতো। সে হয়তো আর আসবে না কোনদিনই কিন্তু বাড়িটা তার চেনা। ইচ্ছে করলে আসতেও পারে।

আগে এমন হতো না, আজকাল হাজরার মোড়ে গেলে আশুতোষ কলেজের সামনে দিয়ে হেঁটে গেলে, কালীঘাট পার্কের পাশ দিয়ে গেলে

কেন যেন অকারণে বারবার মনোরমার কথা মনে পড়ে। বারবার মনে করার চেষ্টা করে চোদ্দ বছর আগের দু-একটা টুকরো টুকরো কথা, চোদ্দ-বছর আগের শ্যামলী মেয়েটির মুখের আদল। কেমন অস্পষ্ট, মুছে যাওয়া ছবির মত, ডাক বাক্সে বৃষ্টিতে ভেজা চিঠির মতো—এখন যদি রাস্তায় দেখে মনোরমাকে সে কি চিনতে পারবে?

মনোরমা চিনতে পারবে তাকে?

॥ সাত ॥

দুই আত্মারাম

'কূর্মলোম জটাচ্ছন্ন শশশৃঙ্গ ধনুর্দ্ধরঃ।
এষ বন্ধ্যাসুতো যাতি খপুষ্প কৃতশেখরঃ॥'
'পরিধানে কচ্ছপের লোমের বসন,
হাতে খরগোশের সিং দিয়ে তৈরি ধনুক।
ঐ যাচ্ছে বন্ধ্যা রমণীর পুত্র,
মাথায় তার আকাশ কুসুমের মালা॥'

যোগবাশিষ্ট রামায়ণ

উঠোনের বেলগাছটা পড়ে যাওয়ার পরে, একদিন আস্তে আস্তে বেদীটাও ভেঙে গেলো, নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলো কাকাবাবুর বাটিটা।

প্রথম প্রথম আত্মারাম রাতে শোয়ার আগে একটা রুটি কি একটা পাঁউরুটির টুকরো কাকাবাবুর উদ্দেশ্যে উঠোনের মধ্যে ছুঁড়ে দিতো। যেভাবে বাড়ির পোষা কুকুরকে লোকে খাবার দেয়। কিন্তু একদিন তার নিজেরই খেয়াল হলো, হতে পারে ভূত, হতে পারে অশরীরী তাই বলে কি নিজের পূর্বপুরুষকে এইভাবে অবহেলা করা উচিত।

পরের মাসের প্রথমে টিউশনির মাইনে পেয়ে কালীঘাট মন্দিরের সামনের একটা ফুটপাথের দোকান থেকে একটা কানা উঁচু অ্যালু-মিনিয়মের বাটি কিনে আনলো কাকাবাবুর জন্যে সে।

আত্মারাম জীবনে প্রায় সবদিক থেকেই অসফল। বারার মৃত্যুর পর বাড়ির পিছনের অংশটুকুতে তারা সরে যায়। সামনের পুরনো একতলা অংশটুকু তার জন্মের বহুকাল আগেই বিক্রি হয়ে গিয়েছিলো। মধ্যের অংশটুকুও বেচে দিতে হলো কলেজে পড়ার সময়। বাড়িতে ভূত আছে বলে ভালো খরিদ্দার পাওয়া গেলো না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যারা কিনলো তারাও কেন যেন আর এলো না। মধ্যের অংশটা তারপর থেকে তালা বন্ধই পড়ে থাকলো।

নিচে দুখানা ঘর, সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় একটা চিলেকোঠা ঘরের মতো এইটুকু অংশে এসে আত্মারামের সময়ে ভট্টাচার্য-বাড়ি পৌঁছালো। দোতলায় চিলেকোঠা ঘরে কেউ উঠতো না। ঐ সিঁড়ি দিয়ে ছাদে বহু-কাল কেউ ওঠেনি। ধুলোয়, ময়লায় মাকড়সার জালে ভর্তি সে সিঁড়ি চিলেকোঠা ঘর চামচিকেয় ভর্তি। সেখানেই কাকাবাবু নিরিবিলিতে থাকেন।

একতলায় দুখানা ঘরেব একখানায় ঠাকুর্দা-ঠাকুমা, পরে ঠাকুর্দা একা আর অন্যখানায় আত্মারামের মা আর সে থাকতো, এখন পুরোটাই তার।

কিন্তু এই ভাঙ্গা বাড়ির হাত থেকে তার অব্যাহতি চাই। কাকাবাবুকে ফেলে যাওয়া চলবে না। তবু কাকাবাবু কি এই বাড়ি ছেড়ে তার সঙ্গে অন্য কোথাও যেতে রাজি হবে? কাকাবাবুর কি অনুমতি পাওয়া যাবে এই বাড়ি বিক্রি করার জন্যে? কাকাবাবুর বিনা অনুমতিতে সে কি করে এই বাড়ি বেচবে, এই বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে?

দ্বিধাগ্রস্ত আত্মারাম সবশেষে কাকাবাবুর সঙ্গে যোগাযোগ করা মনস্থ করলো। উঠোনে অ্যালুমিনিয়মের বাটিতে খাবার দিয়ে একদিন সারারাত বারান্দায় জলচৌকি টেনে নিয়ে না ঘুমিয়ে বসে রইলো। কাকাবাবু যখন খেতে আসবেন, ধরবে। কিন্তু কাকাবাবু এলেন না। অনেকরাতে দুটো ধেঁড়ে ইঁদুর এসে সেদিনের দেওয়া পাঁউরুটির টুকরোটা নিয়ে হুটোপুটি শুরু করে দিলো।

আরেকদিন দুপুর বেলায় দোতলায় সিঁড়ি দিয়ে চিলেকোঠার ঘরে গেলো আত্মারাম। বোধহয় গত তিরিশ বছর এই সিঁড়ি দিয়ে কেউ

নামা ওঠা করেনি। ধুলো ময়লা, মাকড়সার জাল, ইঁদুর-আরশোলার রাজত্ব পেরিয়ে দোতলার ভাঙা দরজা জানালা বন্ধ শূন্য ঘরে পৌঁছালো আত্মারাম। বহুদিন পরে এঘরে কোনো মানুষেব প্রবেশে চামচিকেরা বিচলিত বোধ করলো। তারা চিঁচিঁ করতে করতে ঘরের মধ্যে ঘুরপাক খেতে লাগলো। আত্মারাম বেরিয়ে এসে শূন্য ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে ঘরের দিকে মুখ করে বললো, 'কাকাবাবু, একটা কথা আছে। আমরা আর এ বাড়িতে থাকবো না। আমরা অন্য কোথাও যাবো। আপনি আমার সঙ্গে চলুন। আপনি অনুমতি দিন। আমি এবাড়ি বেচে দিই।'

আত্মারামের অনুনয়ে কোনো কাজ হল না। কাকাবাবু কোন উত্তর দিলেন না।

দিনের বেলায় কাকাবাবুব হয়তো প্রকাশিত হতে সঙ্কোচবা অসুবিধে হচ্ছে এই ভেবে আত্মারাম একদিন দেশলাই কাঠি জ্বালিয়ে জ্বালিয়ে রাতের বেলায় দোতলায় উঠলো। কিন্তু কাকাবাবুর উত্তর পাওয়া গেলো না।

এ অবস্থায় আর কি করা যাবে। অবশেষে আত্মারাম ঠিক করলো কাকাবাবুকে সুদ্ধই বাড়ি বেচে দেবে। আজকাল সে কাগজে দেখে অনেক পুরনো বাড়ির বিক্রির বিজ্ঞাপন বের হয়। 'ভাড়াটেসহ বাড়ি বিক্রয়।' সে ঠিক করলো কাগজে বিজ্ঞাপন দেবে 'ভূতসহ বাড়ি বিক্রয়।' যে কিনবে তার সঙ্গে চুক্তি হবে, চিলেকোঠার ঘর তোমার নয়, ওটা কাকাবাবু যতদিন থাকবে ততদিন কাকাবাবুর।

এসব পরিকল্পনা করা কঠিন নয়। কিন্তু খবরের কাগজে গিয়ে বিজ্ঞাপন দিয়ে বাড়ি বেচে গুটিয়ে চলে যেতে যে উদ্যোগের দরকার তা কোনোদিনই আত্মারামের নেই।

এই সময়ে একদিন রাতে আত্মারাম স্বপ্ন দেখলো, খুব পুরনো স্বপ্ন, কিন্তু একটু আলাদা। ওষুধের গন্ধে ভরা একটা হাসপাতালের বিশাল লম্বা চওড়া উঁচুছাদ হল ঘরের মতো ওয়ার্ড। স্বপ্নের মধ্যে আস্তে আস্তে হলঘরটা বড় হতে লাগলো। ময়দানের মত বড় হয়ে গেলো। সেই হল ঘরে হাজার হাজার লোহার খাটে হাজার হাজার রোগীর মধ্যে সে

আর কাকাবাবু পাশাপাশি খাটে শুয়ে রয়েছে। কাকাবাবু চাদর মুড়ি দিয়ে পাশ ফিরে শুয়ে রয়েছেন, তাঁর মুখ সে দেখতে পাচ্ছে না। দেখলেও কোনো সুবিধে নেই কারণ আত্মারাম কাকাবাবুকে কখনো দেখেনি, চিনতে পারবে না। তবুও ঘুমের মধ্যে আত্মারাম বুঝতে পারলো এইই কাকাবাবু, ফিনাইলের গন্ধে ভেজা চাদরমোড়া কণ্ঠস্বর শুনতে পেলো কাকাবাবুর, 'আর নয়। চলো আত্মারাম অন্য কোথাও চলে যাই।'

ঘুম ভাঙতেই আত্মারাম বুঝতে পারলো কাকাবাবুর অনুমতি পাওয়া গেছে। কাকাবাবুও তার সঙ্গেই বাড়ি ছাড়বেন।

আর বাধা রইল না। এখন বাধা শুধু মনোরমা। যদি কোনোদিন মনোরমা মিত্র নামে সেই শ্যামলী, কাজল দীঘির অতল চোখের মেয়েটি, (মনোরমা কি এখনো মিত্র আছে?), কলকাতায় এসে তার খোঁজ করে। যদি এই ভাঙ্গা বাড়ির দরজা থেকে ফিরে যায়? আত্মারামের কেন যেন অনেকদিন আগে ছোটবেলায় ভূগোল বইয়ে পড়া মধ্য নিশীথের সূর্যের কথা মনে পড়ে। অনেকদিন আগের কালীঘাট পার্কের প্রথম সন্ধ্যার কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে কয়েকটি অমোঘ, অসংলগ্ন পংক্তি,

শেষবার তার সাথে যখন হয়েছে দেখা
মাঠের উপরে
বলিলাম—'একদিন এমন সময়
আবার আসিয়ো তুমি—
আসিবার ইচ্ছা যদি হয়।'

অনেক কবিতা, অনেক স্বপ্ন, অনেক 'চিন্তার অবসানে আত্মারাম সিদ্ধান্ত করলো এবাড়ি ছেড়ে যাওয়ার আগে একবার মনোরমাকে জানিয়ে যেতে হবে। সে যদি সত্যিই কখনো আসে, যেন ফিরে না যায়।

কয়েকদিন ধরে উথালপাথাল বৃষ্টি হচ্ছে। শ্রাবণের শেষ কিন্তু বৃষ্টির বিরাম নেই। বৃষ্টি পড়ছে স্বর্গ থেকে, শূন্য থেকে, আকাশ থেকে, মেঘ থেকে আত্মারামের ভাঙ্গা বাড়ির ছাদ থেকে, দেয়াল থেকে।

প্রথমে কয়েকদিন ভেজা গদিতে শুয়ে তারপরে খাটের নিচে স্যাঁত-সেঁতে মেজেতে শুয়ে আত্মারামের শরীরটা খারাপ হলো, এটু সর্দি, একটু

কাশি, একটু নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট। অল্প অল্প জ্বর।

এরই মধ্যে এইদিন সকালবেলা, খুব সকালবেলা জ্বরজ্বর শরীরে আত্মারাম ঘুম থেকে উঠে অনেকদিন পরে দাড়ি কামালো। মাথাটা একটু দপদপ করছে। কয়দিন স্নান করা হয়নি, একটু জল দিয়ে মাথাটা ধুয়ে নিলো।

আজ সকালে বৃষ্টি নেই। আত্মারামের উঠোন থেকে যতটুকু আকাশ দেখা যায় সবটুকু নীল, কোথাও মেঘের চিহ্ন নেই।

আজ আত্মারাম খড়্গপুর যাবে মনোরমার খোঁজে। হাওড়া স্টেশনে গিয়ে টিকেট কিনে খড়্গপুর পৌঁছাতে পৌঁছাতে বেলা এগারোটা।

খড়্গপুরে রেলের অফিসের ছড়াছড়ি। এর মধ্যে ঠিক কোন অফিসে মনোরমার বাবা কাজ করেন মনোরমারা রেলকলোনির ঠিক কোন্ পাড়ায় থাকে কিছুই আত্মারামের জানা নেই। মনোরমার বাবার নামটাও এই চোদ্দ বছর পরে কিছুতেই মনে করতে পারছে না সে, এখন তার সম্বল মনোরমার বাবা মিস্টার মিত্র। শুধু এইটুকু সঙ্কেত।

তিনটে অফিসে পাঁচজন মিস্টার মিত্রের সঙ্গে দেখা হলো আত্মারামের, কিন্তু তারা কেউ মনোরমা মিত্র নাম্নী মায়াবী তরুণীর বাবা নয়। অনেক ঘুরে ঘুরে কয়েক কাপ চা খেয়ে ক্লান্ত, অসুস্থ আত্মারাম অবশেষে একটা সঠিক অফিসে পৌঁছালো। সে অফিসে অনেকদিন আগে মিস্টার মিত্র ছিলেন। অফিসের লোকেরা অবশ্য মিস্টার মিত্র বললো না, বললো মিত্রবাবু।

কিন্তু মিত্রবাবু তো বহুকাল আগে এখান থেকে বিলাসপুরে বদলি হয়ে যান। আর এতদিনে নিশ্চয়ই রিটায়ার করে গেছেন। একজন মোটা মতন ভারিক্কি চেহারার লোক আত্মারামকে দুবার ভালো করে পর্যবেক্ষণ করে চেঁচিয়ে ডাকলেন তিন টেবিল ওপারে আরেকজনকে, 'ও নরেশদা, ডেসপাচ সেকশনের বড়বাবু, ঐ যে মিত্রবাবু বিলাসপুর বদলি হয়ে গিয়েছিলেন এখান থেকে, তিনি রিটায়ার করেন নি এতদিনে?'

নরেশদা একটা বোঁটায় লাগানো চুন দিয়ে মুখের পান কষে কষে চিবোতে চিবোতে উত্তর দিলেন, 'অন্তত পাঁচ বছর'। তারপর পাশের

জানালা দিয়ে অবহেলা ভরে একটু রক্তিম পিক ছুঁড়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কে জানতে চাইছে ?'

আত্মারাম বিনীত ভাবে নরেশদার পাশে গিয়ে দাঁড়ালো, সারাদিন অসুস্থ শরীরে খালি পেটে চা খেয়ে খেয়ে তখন তার গা গোলাচ্ছে, সে খুব নরম ভাবে বললো, 'আজ্ঞে আমি ওঁর এক দূর সম্পর্কের আত্মীয়, খড়্গপুর এসেছিলাম ভাবলাম একটু খোঁজ করে যাই।'

নরেশদা বললেন, 'ঐ তো বললাম, এখান থেকে বিলাসপুর গিয়েছিলো। তারপর রিটায়ার করে কোথায় গেছে বলতে পারবো না। বোধ হয় কলকাতায়ই ফিরে গেছে।'

কপালের দুপাশে দুটো শিরা দপদপ করে জ্বলছে আত্মারামের। লজ্জার মাথা খেয়ে চোখ নিচু করে মেঝের দিকে তাকিয়ে আত্মারাম বললো, 'আচ্ছা ওঁর যে বড় মেয়ে মনোরমা সে কোথায় আছে কিছু জানেন।'

আত্মারাম যা ভেবেছিলো তা নয়, নরেশদা প্রশ্নটাকে তেমন খারাপভাবে নিলেন না, উল্টোদিকের টেবিলে বসা অন্য এক প্রবীণ ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আচ্ছা বড়দা, মিত্রবাবু এখান থেকে যাওয়ার আগে বড় মেয়ের বিয়ে দিয়ে গেলেন না, কোথায় যেন বিয়ে হলো মেয়েটার।'

বড়দা অনেকক্ষণ ভেবে বললেন, 'ঠিক মনে পড়ছে না। পাত্র বোধহয় কলকাতারই হবে। আজকাল সব পাত্রই তো কলকাতার।'

আত্মারাম আর দাঁড়ালো না। নিঃশব্দে রেলের অফিস থেকে বেরিয়ে একটা রিক্সা নিয়ে স্টেশনে চলে এলো। গাড়িতে উঠে সে সন্ধ্যার পর যখন কলকাতায় এসে পৌঁছালো তখন তুমুল বৃষ্টি, কলকাতার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছে। স্টেশনে বাস-ট্রাম কিছুই নেই। শহরের সমস্ত রাস্তাঘাট জলের নিচে ডুবে গেছে।

আত্মারাম বিন্দুমাত্র চিন্তা করলো না। বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে, বাদল হাওয়ায় কাঁপতে কাঁপতে কখনো হাঁটুজল, কখনো কোমর জল ভেঙে সে বাড়ির দিকে রওনা হলো। অবশেষে এক সময় তার বাড়িতে তার ঘরে এসে পৌঁছালো।

তখন অনেক রাত। তখনো বৃষ্টি ঝরে যাচ্ছে। শুধু আকাশ থেকে সরাসরি নয়। আত্মারামের ভাঙ্গা বাড়ির ছাদ থেকে তার শোয়ার ঘরের মধ্যে অঝোরে জল পড়ছে।

এরই মধ্যে ঘরের একপ্রান্তে সে তার ক্লান্ত দেহ গুটিয়ে নিয়ে মেজের উপর শুয়ে পড়লো।

কতক্ষণ, কত ঘণ্টা, কতদিন আত্মারাম এভাবে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলো সে তা জানে না। তার কোনো হিসেব সেই। শুধু এক শেষ রাতে, তখন গুরুবর্ষণ স্তব্ধ, তার তন্দ্রা, তার আচ্ছন্নতা, তার ঘুম ভাঙলো।

কে যেন ঘরের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে?

কোনদিন তাঁকে দেখেনি, তবু পায়ের শব্দে চোখ মেলে আত্মারাম দেখে বুঝতে পারলো কাকাবাবু এসে দাঁড়িয়ে আছেন তার ঘরের দরজায়। এর আগে কাকাবাবুর সঙ্গে কখনোই দেখা হয়নি আত্মারামের। তবু একবার তাকিয়ে দেখেই সে কাকাবাবুকে চিনতে পারলো।

এই মুখের আদল, এই চেহারা তার বহুদিনের চেনা। আঠারো-উনিশ বছরে প্রথম বয়েসে আয়নায় দাড়ি কামাতে প্রত্যেকবার সে এই মুখের সামনে মুখোমুখি বসেছে। কাকাবাবুকে একবার দেখেই আত্মারাম সব বুঝতে পারলো, এ তারই হারিয়ে যাওয়া উনিশ বছর বয়েস। কাকাবাবু তার সেই ভালোবাসার দিনগুলি তাকে ফিরিয়ে দিলো। অনেকদিন পরে আত্মারাম যেন নিজেকে খুঁজে পেলো।

আজ শেষরাতে আত্মারামের প্রথম যৌবন কাকাবাবুর চেহারায় মধ্য যৌবনের আত্মারামকে ডাকতে এসেছে। অনেকদিন আগে, প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে এই বাড়িতেই কাকাবাবুর বয়েসী সে সময়ের আত্মারামের বাবাকে দেখে নরহরি সরকার মশায় অহেতুক ভয় পেয়েছিলেন। কিন্তু আত্মারামের ভয় হল না, নিজেকে দেখে কে ভয় পায়?

কাকাবাবু অর্থাৎ হারু অর্থাৎ প্রথম আত্মারাম দ্বিতীয় আত্মারামকে ডাকলো, 'এসো'। আত্মারাম ঘর থেকে বেরিয়ে এলো পিছনে চৌত্রিশ বছরের আত্মারাম, সামনে উনিশ বছরের আত্মারাম, রুগ্‌ণ শ্রান্ত, অসফল আত্মারাম তরুণ কবি আত্মারাম, মনোরমার আত্মারামের পিছন

পিছন উঠোনে এসে দাঁড়ালো। সেখানে কাকাবাবুর অ্যালুমিনিয়ামের বাটিটা বৃষ্টির জলে ভরে আছে। কতদিন কাকাবাবুকে খাবার দেওয়া হয়নি, কে জানে?

চারিদিক নিস্তব্ধ, এরই মধ্যে বাইরের রাস্তায় কার যেন পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। দুই আত্মারাম উঠোন পেরিয়ে প্যাসেজ দিয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়ালো। দিনেব আলো এখনো ফোটেনি। রাস্তায় অনেক জল জমে আছে। একটু ঝিরঝিরে আলতো বৃষ্টি এখনো পড়ছে। পুব দিক থেকে থেমে থেমে একটা হিমেল হাওয়া বইছে। এরই মধ্যে জল ছপ্‌ছপ্‌ করে হাঁটু পর্যন্ত শাড়ি ভেজা, মাথার চুলে বৃষ্টির গুঁড়ো লেগে রয়েছে, কে একজন যেন ভট্টাচার্য বাড়িব দরজার দিকে আসছে। শ্যামলী, দোহারা চেহারার একটি মেয়ে, খুব চেনা-চেনা, বড়ো আত্মারাম আব ছোটো আত্মাবাম দুজনেই তার দিকে তাকিয়ে। মনোরমা অবাক হয়ে গেছে, একজন সেই যাকে সে রেখে গিয়েছিলো চোদ্দ বছর আগে। আর অন্যজন সেও সেই আত্মারাম শুধু চোদ্দ বছর বয়েস বেড়ে গেছে তার। মনোরমা এক মুহূর্তও দ্বিধা করলো না? দুই আত্মারাম জীর্ণ, সিক্ত ভট্টাচার্য বাইরের দরজাব দুপাশে দাঁড়িয়ে আছে। প্রথম আত্মারাম আর দ্বিতীয় আত্মারাম, বড়ো আত্মারাম আর ছোটো আত্মারামের মাঝখানে এসে দাঁড়ালো মনোরমা, তারপর ভিজে ঠোঁট হাতের উলটো পিঠ দিয়ে মুছে বৃষ্টিভেজা গলায় বললো, 'আজ আমি তোমাদের বাড়িতে প্রথম এলাম।'

কুমুদিনী

॥ এক ॥

বড়লোকের পাখি

শেষ রাতের দিকে নদীর উত্তরপ্রান্ত থেকে একটা খুব ঠাণ্ডা বাতাস আসে। কার্তিকের শেষ থেকে শুরু হয় হাওয়াটা, আর কোনো কোনো বছর চৈত্র পর্যন্ত ভোরবেলার উদ্দাম হিমেল ভাবটা থেকে যায়।

ঠাণ্ডা হাওয়ার ভয় করেন না নিবারণবাবু। শীত হোক গ্রীষ্ম হোক, বৃষ্টি বাদল কুয়াশায় তিনি প্রতিদিন সূর্য ওঠার প্রায় এক প্রহর আগে ঘুম থেকে ওঠেন।

নিবারণবাবুর ঘুম থেকে ওঠাব জন্যে অপেক্ষা করে সামনের চরের শেয়ালেরা। যখন কাঠের পাটাতনেব উপরে নিবারণ মজুমদারের খড়মের খট্ খট্ শব্দ তারা পায়, কিছুক্ষণ থেকে তারপর বালির উপর দিয়ে গুটি গুটি একদম যমুনাব জলের কাছে চলে আসে, সেখানে জলের ধারে চারজনের মধ্যে সারি দিয়ে বসে তারা তাদের মুখগুলো আকাশের দিকে করে নিবারণ মজুমদারের খড়মের আওয়াজের কর্কশ প্রতিবাদ জানায়।

নিবারণবাবু এসব তোয়াক্কা করেন না। কারণ তিনি জানেন রাত এভাবেই শেষ হয়। শেয়ালদের গোলমাল নিয়ে তিনি মোটেই মাথা ঘামান না।

এর পরেই ভোর হওয়াব ব্যাপারটা। ভোর হওয়া সোজা নয়, সেটা অনেক গোলমাল। নদীর ওপারে দহাতপুরের মোক্ষদাসুন্দরী ডিসপেন্সারির সামনের বকুলগাছে অনেকগুলো ছোট সাদা ফুলের মধ্যে একটা বিশাল লাল গনগনে আকাশকুসুম টকটক করে জ্বলে উঠবে, তারো আগে ডিকস্ট্রিট্ বোর্ডের রাস্তার পিছনে হাজী সাহেবের ধান-গোলার ওপাশ থেকে একপাল মুরগি রাত ফুরিয়ে যাওয়ার ঘোষণায় মুখর হয়ে উঠবে।

এখনো দিনের ব্যস্ততা শুরু হতে বেশ কিছু সময় বাকি। ওপাশের হিন্দু হোটেলের কাজের ঝি জ্ঞানদা গত রাতের অবশিষ্ট এঁটো বাসন-গুলো নিয়ে নদীর ঘাটের দিকে গেল। উনুনেও আগুন দেওয়া হয়েছে। কাঁচা আম কাঠের জ্বালানি, ধরতে সময় নিচ্ছে। এখনই হিন্দু হোটেলের মালিক তেওয়ারি ঠাকুর ঘুম ভেঙে উঠে হই চই হাঁকডাক শুরু করে দেবে।

প্রথম স্টীমার আসবে সাড়ে সাতটা থেকে আটটার মধ্যে বিরাজগঞ্জ থেকে। সাড়ে ছয়টা কিংবা তারো আগে থেকে পায়ে হেঁটে, টম্‌টম্ গাড়িতে, সাইকেলে যাত্রীরা আসতে শুরু করবে, স্টীমার ছাড়ার মিনিট পনেরো আগে টাউন সার্ভিস ঝরঝরে বাসটাও এসে যাবে আষ্টেপৃষ্ঠে যাত্রী নিয়ে।

জায়গাটার নাম বেড়াবাড়ি। নদীর জল বছরের একেক সময়ে একেক রকমভাবে নামাওঠা করে। বেড়াবাড়িও জলের ওঠানামার সঙ্গে এগিয়ে পিছিয়ে যায়।

বেড়াবাড়ি ঘাটে দিনে রাতে তিনটা স্টীমার যায় আসে। যখন স্টীমার ঘাটে এসে দাঁড়ায় তখন রীতিমত জমজমাটি ব্যাপার। লোকেরা নামে, ওঠে। দূর বিদেশ থেকে বাড়ি ফেরে, বাড়ি থেকে বিদেশ যায়। কাছাকাছি যাতায়াতও আছে। দু'চারজন ইস্কুল মাস্টার, অফিস আদালতের বাবু দৈনিক যাত্রীও আছে।

নিবারণবাবু স্টীমার কোম্পানির বুকিং ক্লার্ক। সকালের দিকটায় একটু বেশি চাপ পড়ে। দু'দিক থেকে দুখানা জাহাজ এক ঘণ্টার মধ্যে এসে পড়ে।

সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে হাতমুখ ধুয়ে, নৈমিত্তিক কাজকর্ম সেরে সাড়ে ছটার মধ্যে বুকিং কাউণ্টারে গিয়ে বসতে হয়।

অবশ্য বুকিং কাউণ্টারের ছোট ঘরটা সাড়ে ছটার অনেক আগেই নিবারণবাবু ঘুম থেকে ওঠার একটু পরে আকাশ যখন অল্প-ফাটা হয়ে এসেছে, সেই সময় সনাতন এসে খুলে দেয়। কুমুদ কোনো কোনো রাতে ঐ ঘরটায় থাকে। খুলে দেওয়ার পর সে ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে বেরিয়ে যায়।

সামনের গ্রাম থেকে সনাতন মাঝি আসে। সে এসে ঐ বুকিং ঘরটা পরিষ্কার করে, তারপর নিবারণবাবুর ঘর, সামনের পাটাতন, নদীর ঘাট থেকে এই জাহাজ ঘর পর্যন্ত পায়ে চলার রাস্তাটা শক্ত বাঁশের ঝাঁটা দিয়ে ঝকঝক করে পরিচ্ছন্ন করে সনাতন।

কত রকমের লোক যায় আসে জাহাজ ঘাটায়। বিড়ির টুকরো, ছেঁড়া কাগজ, পানের পিক কি ভীষণ নোংরা হয়ে থাকে ঘাটটা। সকাল-বিকেল দু'বেলা সনাতন যত্ন করে নিকোয়।

সনাতন এলে বুকিং ঘরের বন্দী দশা থেকে ছাড়া পাবে, এটা কুমুদ জানে। সনাতনের গলার শব্দ, এমনকি পায়ের শব্দ পর্যন্ত সে জানে। নদীর ঘাটের ওপর বাস স্ট্যাণ্ডের পাশে পানের দোকানটা, সেখানে প্রত্যেকদিন ভোরবেলা প্রথম গ্রাহক সনাতন, এক পয়সার বিড়ি কেনে। পানবিড়িওলার সঙ্গে সনাতনের দু'একটা ছোটখাটো কথা হয়।

প্রায় দুশো হাত দূরে তার বন্ধ ঘর থেকে কুমুদ তা শুনতে পায়, সঙ্গে সঙ্গে কঁক কঁক কঁক করে অত্যন্ত কর্কশ কণ্ঠে সে ঘরের মধ্যে থেকে ডেকে ওঠে।

কুমুদের চেঁচানি শুনে নিবারণবাবুও বুঝতে পারেন সনাতন আসছে। তিনিও গলা মেলান, রাস্তার দিকে মুখ করে চেঁচিয়ে ডাকেন, 'এই সনাতন, আর দেরি করিস না রে। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে আয়।'

সনাতন এসে দরজা খুলে দেবার পর সামনের কাঠের পাটাতনটার উপরে উঠে একবার চারদিক পর্যবেক্ষণ করে নেয় কুমুদ। কাঠের পাটাতনটার উপর সারারাত রাশু আর দাশু দুটো কুকুর ঘুমোয়।

কুমুদ ঘরের ভিতর থেকে পাটাতনের উপরে চলে আসা মাত্র বিশু অতি সম্ভ্রমের সঙ্গে কুমুদকে জায়গা ছেড়ে দেয়। তারা নিচে নেমে গিয়ে হিন্দু হোটেলের পিছনের আঁস্তাকুড়ে কিছু খাবার মেলে কিনা তার চেষ্টা করে।

রাশু-দাশু যে কুমুদকে খাতির করে সেটা অকারণে নয়। রাশু নিজে চিরকালই শান্ত প্রকৃতির। সে খুব একটা মারামারি, কাটাকাটি পছন্দ করে না, কাউকে সে ঘাঁটায়ও না। চুরি-চামারি করে, লেজ নেড়ে

সামান্য খাবার জোগাড় করতে পারলেই তার হয়ে গেল। বাকি সময় সে নির্বিকার ভাবে শুয়ে বা বসে থাকে, কিংবা ঘুমোয়। বড় জোর কখনো সখনো দাশু খুব ঘেউ ঘেউ করলে কোনো কিছুর উদ্দেশ্যে তাহলে সে তার দোহার কি করে।

দাশু একটু খেঁকি স্বভাবের। কিন্তু কুমুদ যেদিন এখানে প্রথম আসে সেদিনই শিক্ষা হয়েছিল। সে ঠিক কুমুদকে আক্রমণ করতে যায়নি, অল্প গর্জন করতে করতে সে কৌতূহলী হয়ে নাকটা উঁচু করে কুমুদকে শুঁকতে গিয়েছিল।

দাশুর খুব দোষ দেয়া যায় না। সে দু'চারটে পায়রা, শালিক, কাক-টাক দেখেছে। নদীর ওদিকের ঘাটে, তাছাড়া বাস স্ট্যাণ্ড পেরিয়ে গৃহস্থ পাড়ার দিকেও দাশু মাঝেমধ্যে সময় করে বেড়াতে যায় সেখানে সে পাতি হাঁস দেখেছে। কিন্তু এত বড়ো একটা সাদা ধবধবে পাখি, বিশাল রাশভারী চেহারা, জীবনে প্রথম রাজহাঁস দেখে স্টীমার ঘাটের সামান্য দাশু কুকুরের কৌতূহল হওয়া নিশ্চয় দোষের নয়।

দুঃখের বিষয়, দাশুর সেই অনুসন্ধিৎসা ক্ষণস্থায়ী হয়েছিল। সে নাক বাড়িয়ে কুমুদের কাছে এগিয়ে যাওয়ার আগেই হঠাৎ প্রায় আড়াই ফুট গলা উঁচু করে পায়ের পাতার উপরে সটান দাঁড়িয়ে হলুদ শক্ত ঠোঁট দিয়ে কুমুদ দাশুর শরীরের সব চেয়ে নরম জায়গাটায় ঠিক নাকের ডগায় কালো ঠাণ্ডা অংশটার উপরে তীব্রভাবে আঘাত করলো।

মুহূর্তের মধ্যে দাশুর ভয়ার্ত চিৎকারে জাহাজ ঘাটের নিস্তব্ধ পরিবেশ চমকিয়ে উঠলো।

সেটাও ছিলো এই রকম এক সকাল। তখনো স্টীমার আসতে দেরী আছে। ঘাটে লোকজন বিশেষ কেউ আসেনি।

রাশু দাশু দু'জনেই হিন্দু হোটেলে কাজের লোক জ্ঞানদাদির দু'চোখের মণি। তাদের ছোটবেলা থেকে জ্ঞানদাদি কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছে। চোখ ফোটার অল্প পরেই এদের দু'জনকে জাহাজ ঘাটায় খেতেটেতে পাবে বলে জ্ঞানদাদি গ্রামের ভেতর থেকে নিয়ে এসে পুষেছে।

রাশু-দাশু সারাদিন হোটেলের সামনের উঠোনে থাকে, রাত দশটা পর্যন্ত জ্ঞানদাদি খেয়ে উঠে হোটেলের রান্নার জায়গায় শুতে যাওয়া পর্যন্ত। ছোটবেলায় বহুদিন পর্যন্ত তারা জ্ঞানদাদির কাছেই শুতো, কিন্তু একে তারা বড় হয়ে গেছে, তার উপরে হোটেলেব মালিকের রান্না ঘরে কুকুরকে শুতে দিতে আপত্তি, এখন অনেকদিন হল তারা দু'জনে ঘরের সামনের কাঠের পাটাতনেব উপরে থাকে।

দাশুর করুণ চিৎকার শুনে জ্ঞানদাদি ছুটে এল। নদীর ঘাটে বাসন মাজছিল সে। সেগুলোকে সেখানে সেভাবে বেখেই জ্ঞানদাদি ছুটে এল।

নিবারণবাবু বালিব চড়ায় পায়চারি করতে করতে দাঁতন করছিলেন, তিনিও এলেন। এত সকালবেলায় হঠাৎ কুকুরটা এরকম আর্তনাদ করে উঠলো।

দাশুর তখন নাক দিয়ে দরদর করে রক্ত পড়ছে। সে আর রামু দু'জনেই পাটাতন থেকে লাফিয়ে নিচে নেমে এসেছে। তাদের লেজ গোটানো, চেহারায় ভীত সন্ত্রস্ত ভাব।

সামনের পাটাতনেব উপরে অত্যন্ত ভারিক্কি ভঙ্গিতে পুরো দৃশ্যটা লক্ষ্য করছে একটা বিরাট রাজহাঁস।

নিবারণবাবু আব জ্ঞানদাদি দু'জনেই তাকে দেখলেন। জ্ঞানদাদি বললেন, 'এটাকে তো আগে দেখিনি। এ জানোয়ারটা আবার এখানে কোথা থেকে এল?

নিবারণবাবু বললেন, 'বোধহয় সামনের গ্রাম থেকে এসেছে।'

ততক্ষণে সনাতন কাজে এসে গেছে। সেও এসে রাজহাঁসটাকে দেখলো। সনাতন বলল, 'সামনের গ্রাম থেকে কি করে আসবে? তার পাশে তো সব গরীবের গ্রাম, এসব গ্রামে এরকম হাঁস কারো নেই। এতো বড়লোকের পাখি।'

॥ দুই ॥

স্বপ্নের কুমুদ

সেই থেকে রাজহাঁসটা এই জাহাজ ঘাটায়।

আর. এস. এন. কোম্পানির বেড়াবাড়ি স্টীমার স্টেশনের বুকিং বা নিবারণবাবুই স্টেশনের অভিভাবক। তাঁকে লোকে আজকাল মাস্টার-বাবু বলে। নিবারণবাবু শুধু বুকিং বাবু নন। তিনি একধারে টিকিট বেচেন, যাত্রী নিয়ন্ত্রণ করেন, স্টেশন মাস্টারের যা কাজ প্রায় সবই তাঁকে করতে হয়। তাঁকে সাহায্য করার লোক বলতে ঐ যা সনাতন।

আগের যিনি স্টেশন মাস্টার ছিলেন তিনি তিন মাস আগে বিয়ে করতে দেশে গিয়েছিলেন, তারপর আর ফেরেননি। লোকে বলে মাস্টারবাবু ঘর জামাই হয়েছেন, আর এই চাকরিতে আসবেন না।

সে যা হোক নিবারণবাবু যথাসাধ্য স্টেশন মাস্টারের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। আর. এস. এন. কোম্পানির ব্রাঞ্চ অফিস কাছেই। এখান থেকে স্টিমারে মাত্র দেড় ঘণ্টার পথ। তেমন কিছু অসুবিধে হলে সেখান থেকে লোক আসে সাহায্য করতে। তাছাড়া প্রত্যেক স্টীমারের সঙ্গেই ক্যাশিয়ারবাবু একজন আসেন, তিনি তখনকার টিকিট বিক্রির হিসেব দেখে, নদগ টাকা পয়সা সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে যান। সে ব্যাপারে কোনো ঝুট-ঝামেলা নেই। মাসের প্রথমে নিবারণবাবু আর সনাতনের মাইনের টাকাও ক্যাশিয়ারবাবুই দিয়ে যান।

প্রত্যেক স্টীমারের সঙ্গে খালাসীরা থাকে। তারাই মালপত্র লোক-জন উঠানো, নামানো, স্টীমার ঘাটে লাগলে সিঁড়ি লাগানো, তারপরে ছাড়ার সময় সারেং—সাহেব শেষ সিটি বাজানোর পর জলের ওপর থেকে সিঁড়ি গুটিয়ে নেয়া এইসব করে।

নিবারণবাবুর রাজহাঁসকে কয়েকদিনের মধ্যে সবাই চিনে ফেলল।

মানদায়িনী হাই ইংলিশ স্কুলের সেকেণ্ড পণ্ডিতমশায়, জয়গোপাল কাব্যতীর্থ, তিনি থাকেন নদীর ওপারের একটা গ্রামে। এখান থেকে কিছু দূরে যে ছোট শহর, সেখানে মানদায়িনী স্কুল। প্রত্যেক সপ্তাহে

শনিবার দিন বিকেলের ষ্টীমারে বাড়ি যান জয়গোপালবাবু আর সোমবার সকালের ষ্টীমারে ফিরে আসেন। সারা সপ্তাহটা স্কুল বোর্ডিং-এ কাটে।

জয়গোপালবাবু শুধু কাব্যতীর্থ নন। তিনি কাব্যরসিক মানুষ। বৎসরান্তে স্কুলের সরস্বতী পুজোব নেমন্তন্ন পত্রে একটা করে নতুন সংস্কৃত পদ্য তিনি নিজেই রচনা করে দেন।

রাজহাঁসটা জাহাজ ঘাটায় প্রথম যেদিন আসে সেটা ছিল সরস্বতী পুজোর দিন কয়েক আগের এক বুধবার। সেই শনিবার দিন সরস্বতী পুজো ছিলো বলে জয়গোপালবাবু বাড়ি যেতে পারেননি। কিন্তু জাহাজ ঘাটায় বিকেলের দিকে এসেছিলেন বাড়ির গ্রামেব বা আশেপাশের কোনো লোকের সঙ্গে দেখা হলে তাকে বলে দেবেন বাড়িতে জানিয়ে দিতে যে ফিরতে পারছেন না, একেবারে পরের শনিবার ফিরবেন।

নিবারণবাবুর টিকিট ঘরে একটা কাঠের বড় তক্তা বেঞ্চির মত করে দুটো মোটা বাঁশের সঙ্গে লাগানো আছে। সেই বেঞ্চির উপরে কাব্যতীর্থ মশায় বসেছিলেন।

এমন সময় রাজহাঁসটা পুরো জাহাজ ঘাটটা একবার পাক মেরে সব কিছু দেখেশুনে তারপর বুকিং ঘরে ঢুকলো। এ কদিন ধরে নিবারণবাবু হাঁসটার এই ব্যাপারটা খেয়াল করেছেন। কিছুক্ষণ ঘুরে ফিরে তারপর একবার বুকিং ঘরে এসে বিশ্রাম করে যায়।

রাজহাঁসটা ঘরে ঢুকে নির্বিকারভাবে একটা লাফ দিয়ে যেখানে পণ্ডিতমশায় বসেছেন তার পাশে গিয়ে বসলো।

এত বড় একট অতিকায় পাখি কিন্তু চেহারার মধ্যে একটা রাজকীয় ভাব। একটা সৌম্য ব্যক্তিত্ব রয়েছে চাল চলনে, চলাফেরায়, চোখের দৃষ্টিতে।

পণ্ডিতমশায় এবার সরস্বতী পুজোয় যে সংস্কৃত পদ্যটা লিখেছেন, তাতে একটা শ্বেতশুভ্র স্বর্গীয় মরালের কথা আছে, যে পারিজাত কাননের কাকচক্ষুজল দীর্ঘিকায় কুমুদ কহ্লারের সঙ্গে বাণীদেবীর চরণতলে খেলা করছে।

রাজহাঁসটাকে একটু দেখে ভয় ভয় করছিল পণ্ডিতমশায়ের আবার সেই সঙ্গে নিজের কবিতাটার কথাও মনে পড়ল।

রাজহাঁসটা আলতোভাবে তাঁর পাশে গিয়ে বসতে তিনি একটু সংকুচিত হয়ে সরে গিয়ে নিবারণবাবুকে বললেন, 'ও নিবারণ, চমৎকার হাঁসতো। কিনলে নাকি, পুষবে?'

নিবারণবাবু কাউণ্টারের ভিতর দিয়ে এক যাত্রীর কাছ থেকে টিকিটের দাম নিচ্ছিলেন, একটা ঘষা দোয়ানি দিয়েছিলেন খুচরো ফেরতের সঙ্গে। সে লোকটা নেবে না। নিবারণবাবু দাঁত খিঁচোচ্ছিলেন 'নেবে না মানে। সরকারি পয়সা। আর একি আমি বানিয়েছি নাকি, এ তো তোমরাই কেউ দিয়েছো?'

লোকটা আমতা আমতা করে দোয়ানিটা নিয়ে চলে গেল। লোকটা আনাজের ব্যাপারী, ওপারের হাট থেকে সপ্তাহে দু'দিন তরিতরকারি নিয়ে টাউনে আসে। সব সময়েই তার কাছে নিয়মের বেশি মাল থাকে। নিবারণবাবুকে চটিয়ে তার সুবিধে হবে না, দোয়ানিটা বাজারে কেনাবেচার সময় কোনো খদ্দেরকে গছিয়ে দেয়া যাবে' সে কেটে পড়ল।

নিবারণবাবু পণ্ডিতমশায়ের প্রশ্নের খেই ধরলেন এবার, 'না না। কিনবো কোথা থেকে? কোন্ জায়গা থেকে যেন একা একাই চলে এসেছে। ভারী ভাল হাঁস, মাথায় হাত দিন। কিছু বলবে না।'

পণ্ডিতমশায় ভয়ে ভয়ে পাখিটার মাথায় হাত দিলেন, সে মাথাটা নিচু করে গলাটা দিয়ে পণ্ডিতমশায়ের কনুইতে ঘষতে লাগল, আর আরামে চোখ বুজে রইল।

সেদিন পণ্ডিতমশায় যতক্ষণ রইলেন, হাঁসটা তার কোল ঘেঁষে বসে রইলো, তাবপর তিনি যখন ফিরে গেলেন সন্ধ্যার একটু আগে, সন্ধ্যায় আবার সরস্বতীর আরতি আছে, হাঁসটা পিছু পিছু বাস স্ট্যাণ্ড পর্যন্ত এগিয়ে দিল।

তারপর আনেক রাত্রে সরস্বতী পুজোর খাটাখাটুনির গোলমালের পর যখন ক্লান্ত জয়গোপাল কাব্যতীর্থ ঘুমোলেন তিনি সাদা রাজ-

হাঁসটাকে স্বপ্নে দেখলেন। স্বর্গের গঙ্গা মন্দাকিনী নদীর নীলজলে বিরাট সাদা রাজহাঁস জল ছিটিয়ে দুষ্টুমি করে খেলা করছে, আর নদীর তীরে দাঁড়িয়ে মা সরস্বতী তাকে ডাকছেন, 'কুমুদ, কুমুদ। আর জলে থেকো না। কুমুদ, ভাল হবে না বলছি, তাড়াতাড়ি উঠে এস।'

শেষ রাতে স্বপ্ন, শীতের ঠাণ্ডা বাতাসের আর নীল কুয়াশার আবেগ জড়ানো হিমেল তন্দ্রা। জয়গোপাল কাব্যতীর্থ তন্দ্রা থেকে উঠে, বোর্ডিংয়ের মাঠের মণ্ডপে সরস্বতী ঠাকুরকে একটা প্রণাম করে চোখ বুজে স্বপ্নটা জড়িয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তিনি স্বপ্নে যে সরস্বতীকে দেখেছেন এই মূর্তির সরস্বতীর থেকে অনেক বেশি সুন্দরী, তার শরীরের ত্বকে কেমন একটা গোলাপী আভা, চোখের মণি অতসী ফুলের মত নীল।

প্রতিমার সামনে দাঁড়িয়ে প্রায় স্বপ্নাচ্ছন্ন অবস্থায় জয়গোপালবাবুর কেমন ঘোর এসে গিয়েছিল। একটু পরে সম্বিৎ ফিরে আসতে মোটা তুষের আলোয়ানটা দিয়ে কানমাথা ভাল করে ঢেকে, শরীরটা ভালভাবে জড়িয়ে স্টীমার ঘাটের দিকে রওনা হলেন।

পণ্ডিতমশায় যখন ঘাটে পৌঁছলেন, তখনো পুরোপুরি সকাল হয়নি। সবে সনাতন এসে ঘরটর ঝাট দিচ্ছে। বুকিং ঘর খুলে দিয়েছে হাঁসটা ধীরেসুস্থে চারপাশে পায়চারি করছে দুলে দুলে। পণ্ডিতমশায়কে বাস স্ট্যাণ্ডের মুখে দেখতে পেয়েই সে দ্রুত পায়ে কঁক কঁক করে ডাকতে ডাকতে তাঁর কাছে এগিয়ে গেল।

পণ্ডিতমশায়ের কাছে গিয়ে সে একবার ডানা ঝেড়ে ফূর্তিতে তীব্র একটা চিৎকার দিল। রাজহাঁসটাকে আজ খুব যত্ন করে পণ্ডিতমশায় দেখলেন, না, কোনো সন্দেহ নেই, এই হাঁসটাকেই কাল রাতে তিনি স্বপ্নে দেখেছেন।

এত সাত সকালে পণ্ডিতমশায়কে দেখে নিবারণবাবু অবশ্যই একটু অবাক হলেন। তখন তাঁর মুখ ধোয়া শেষ হয়েছে। বুকিং ঘরের পাশের একটা কাঠের কামরাতে তাঁর বাস। সেখানে একটা কৌটোর মধ্যে কিছু মুড়ি, বাতাসা তাঁর রাখা থাকে। সেটাই তাঁর দুবেলার

জলখাবার। কখনো খেতে ইচ্ছে হলে হিন্দু হোটেলের ওপাশের চমচম রসগোল্লার কোনো দোকান থেকে একটা দুটো মিষ্টি কিনেও খান।

পণ্ডিতমশায় যখন এলেন, নিবারণবাবু ঐ মুড়ি, বাতাসা খাচ্ছিলেন। আজ কয়েকদিন হল রাজহাঁসটা তাঁর মুড়ির ভাগীদার হয়েছে। তিনি দিয়ে দেখেছেন, বাতাসা খায়না কিন্তু মুড়ির খুব ভক্ত।

আগে কুকুর দুটো রাশু-দাশু মুড়ি খাওয়ার জন্যে তাঁর কাছে আসতো, আজকাল আর হাঁসটার ভয়ে এগোয় না।

পণ্ডিতমশায়ের সঙ্গে হাঁসটা নিবারণবাবুর কাছে এল। নিবারণবাবু কয়েকটা মুড়ি পায়ের কাছে ছড়িয়ে দিলেন, সে যত্ন করে খুঁটে খুঁটে খেতে লাগল।

এতটা পথ হেঁটে এসে এই শীতকালেও পণ্ডিতমশায় রীতিমত ঘেমে গেছেন। শহরের মধ্যে তাঁর স্কুল বোর্ডিং থেকে এই নদীর ঘাট প্রায় পাঁচ-ছয় মাইল রাস্তা

পণ্ডিতমশায় বুকিং ঘরের মধ্যে গিয়ে বেঞ্চিতে বসলেন। কালকের মতই হাঁসটা উঠে তাঁর পাশে বসে মাথা ঘষতে লাগল।

মুড়ি বাতাসা খাওয়া শেষ করে এক গেলাস জল খেয়ে নিবারণবাবু এলেন। পণ্ডিতমশায় সবিস্তারে তাঁর স্বপ্নের গল্পটা নিবারণবাবুকে বললেন।

নিবারণবাবু সাদাসিদে মানুষ। হঠাৎ একটা রাজহাঁস এসে গেছে, এটাই তাঁর কাছে একটা অলৌকিক ব্যাপার। তার উপরে শ্রদ্ধেয় জয়গোপাল কাব্যতীর্থের এই স্বর্গীয় স্বপ্ন, তিনি কেমন অভিভূত হয়ে বারবার সাদা রাজহাঁসটার দিকে তাকাতে লাগলেন।

বোধহয় কোনো শাপগ্রস্ত কিন্নর বা দেবতা। কিংবা স্বয়ং মা সরস্বতীরই বাহন। দেখেছো, ঠিক সরস্বতী পুজোর সময় চলে এসেছে।

কিন্তু এখানে এই জাহাজ ঘাটায় কেন? এখানে বিদ্যা বা সঙ্গীতচর্চা নেই, কোনো সাধক নেই এসবের। তিনি ম্যাট্রিক ফেল, জাহাজ কোম্পানির সাড়ে সতেরো টাকা মাইনের তুচ্ছ বুকিং ক্লার্ক, তাঁকে মা সরস্বতীর এই দয়া কেন?

পণ্ডিতমশায়ের স্বপ্ন বর্ণনা তখন শেষ হয়েছে। মন্দাকিনী নদীর জল এই দিশি যমুনার মত ঘোলা নয়। ঝকঝকে নীল। সেখানে এই হাঁস খেলা করে, মা সরস্বতী তাঁকে কুমুদ বলে ডাকেন।

কথা বলা শেষ করে পণ্ডিতমশায় একবার হাঁসের মাথায় হাত রেখে, 'কুমুদ' বলে ডাকলেন, সঙ্গে সঙ্গে সে ডানা ঝাপটিয়ে, গলা উঁচু করে কঁক কঁক করে ডেকে উঠলো।

পণ্ডিতমশায় অভিভূতের মতো বললেন, 'দেখলে তো নিবারণ, ঐ হল কুমুদ। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।'

এই সময় কুমুদ আরেকবার ডানা ঝেড়ে ডেকে উঠলো।

॥ তিন ॥

ঘাটের কুমুদ

এরপর থেকে কুমুদ নামটা পাকাপাকিভাবে বহাল হয়ে গেল।

সাধারণ যাত্রীরা, স্টীমারের খালাসীরা, এমনকি বাস স্ট্যাণ্ডের লোকজন, ডিস্ট্রীক্ট্ বোর্ডের রাস্তা দিয়ে যারা যায় সবাই কুমুদকে চিনে ফেলল।

এসব অঞ্চলে রাজহাঁস দেখাই যায় না। এমন কি দূরপাল্লার যে সব নৌকো নদী দিয়ে যায়। তারা পর্যন্ত জাহাজ ঘাটে কুমুদকে বিস্মিত হয়ে দেখত।

প্রথম প্রথম কুমুদ সন্ধ্যা হওয়া মাত্র জাহাজ ঘাট ছেড়ে জলে নেমে যেত। পারের থেকে অনেক দূরে পঁচিশ, পঞ্চাশ হাত নদীর মধ্যে গিয়ে নিজের কাঁধে ঠোঁট গুঁজে রাত কাটাতো।

প্রথমদিনে সন্ধ্যাবেলা যখন রাজহাঁসটা, তখনো তার কুমুদ নাম হয়নি, নদীর জলে নেমে গেল, সনাতন নিবারণবাবুকে ডেকে বলল, 'কর্তা, হাঁসটা নদীর জলে নেমে নিজের বাড়িতে ফিরে গেল।'

শুনে নিবারণবাবু স্বস্তি পেয়েছিলেন, একটা উটকো ঝামেলা এসে জুটেছিল, একা একাই বিদায় নিয়েছে।

জ্ঞানদাদিও খুশি হয়েছিল, যা মারকুটে জানোয়ার, তার আদরের কুকুরের নাকটা একেবারে ফাটিয়ে দিয়েছে।

রাত আটটার ফিরতি স্টীমারে অনেক লোক নামে। তারা অনেকে রাতের খাওয়া-দাওয়া তেওয়ারির হোটেলে সেরে নিয়ে তারপর টাউনে যায়। কেউ কেউ তেওয়ারির কাছ থেকে চাটাই চেয়ে নিয়ে রাত্রি-বাসও করে বুকিং ঘরের পাটাতনে অথবা হোটেলের খাওয়ার মেঝেতে। গরমের দিনে অনেকে চরের উপর শুয়ে থাকে। সুন্দর শিরশিরে বাতাসে চমৎকার ঘুম আসে।

সকলেরই কাজ পরের দিন সকালে টাউনে। ভোরবেলা উঠে যে যার মত চলে যায়।

যেদিন কুমুদ এসেছিল সেটা শীতের শেষ হলেও তখনো কড়া ঠাণ্ডা রয়েছে এই অঞ্চলে। নদীর চরে কলাই আর সরষের রবিশস্যের মাঠে হিমজলে দানা বাঁধছে ফসল। হুধের বিন্দু জমেছে ধানের ছড়ায়।

একদিক থেকে চমৎকার প্রকৃতি কিন্তু নদীর তীরে বাইরে খোলা চলে ধূ হাওয়ার মধ্যে শুলে নির্ঘাৎ নিউমোনিয়া হবে, সবাই গুটি সুটি হয়ে শুয়ে থাকে বুকিং ঘরের পাটাতনে আর হিন্দু হোটেলের মেঝেতে। অথবা সম্ভব হলে টাউনে চলে যায়, যদি তখন লাস্ট বাসটা থাকে। এত রাত্রে ঠাণ্ডায় কেউ হেঁটে যেতে চায় না।

প্রথম দিন সন্ধ্যায় রাজহাঁস সেই যে নদীর জলের মধ্যে নেমে গেল। তারপর শেষ রাতে যখন নিবারণবাবু খড়ম পায়ে পাটাতনের উপর ঘুমন্ত মানুষগুলোকে পাশ কাটিয়ে খটাং খটাং শব্দ করে, বালির চড়ায় নেমে এসেছেন, হঠাৎ দেখলেন নদীর মধ্যে থেকে অত্যন্ত সাবলীল ভঙ্গিতে যেন জলের মধ্যে উড়ছে, গত কালকের রাজহাঁসটা তরতর করে নদী বেয়ে ঘাটের দিকে আসছে।

সোজা উঠে এল সে, বালির উপর দিয়ে ঝলমল করে চলে এসে নিবারণবাবুর সামনে দাঁড়িয়ে দু'বার পাখা ঝাড়লো, কিছুটা জল ছিটকলো, কিছুটা বালি উড়লো।

পিছনে পিছনে জ্ঞানদাদি এল, তার বুদ্ধি খুব প্রখর। সে বলল,

'হাঁসটা কাল রাত্তিরে কোথাও যায়নি। আমি বাসন মাজতে গিয়ে দেখলাম জলের মধ্যে রয়েছে। সকাল হতে উঠে এল।'

নিবারণবাবু একটু ভুরু কুঁচকোলেন। কিন্তু সনাতন ব্যাপারটার সমাধান করে দিল। সে বলল, 'এই পাখিগুলো খুব সেয়ানা। রাতের বেলা শেয়াল আর বনবেড়ালের ভয়ে জলের মধ্যে গিয়ে থাকে।'

কিন্তু যে কোনো কারণেই হোক কয়েকদিনের মধ্যে কুমুদ জাহাজ ঘাটকে ভালবেসে ফেলল, সন্ধ্যাবেলাতেও লোকজন, মিষ্টির দোকান এ সবের মধ্যে ঘোরায় তার পরম উৎসাহ। এদিকে যায়, ওদিকে দেখে, হই চই-এর মধ্যে সন্ধ্যা কাটায়, তারপর সন্ধ্যার শেষে স্টীমার ছেড়ে গেলে সে নিবারণবাবুর পিছে পিছে হেলতে দুলতে চলে আসে।

নিবারণবাবু ভয় পান, এখানে শেয়ালের বড় উৎপাত, কোথায় অন্ধকারে ঘাপটি মেরে বসে থেকে হঠাৎ হাঁসটাকে তুলে নিয়ে যাবে। সাবধান হওয়ার জন্যে তিনি সনাতনকে বলে দিলেন, 'এই হাঁসটাকে প্রত্যেকদিন রাতে বুকিং ঘরে আটকিয়ে তারপর বাড়ি যাবে।'

কুমুদের কিছুতেই আপত্তি নেই। এমন কি কয়েকদিন পরে তার নাম যে কুমুদ দেওয়া হল তাতেও নয়।

কুমুদ নামটা এখন সকলেরই জানা হয়ে গেছে। নিবারণবাবু অবশ্য কুমুদ নামকরণের রহস্যটা কারো কাছে ব্যক্ত করেননি, কেউ বিশ্বাস করবে না, বলে লাভ কি।

সবাই কুমুদকে চিনে গেছে। স্টীমারের খালাসীরা ঘাটে জাহাজ ভিড়তেই, আয়, চই, চই করে তাকে ডাকে, অনেকে কুমুদ-কুমুদ বলেও ডাকে।

প্রথম দিকে স্টীমার বিষয়ে একটা আশঙ্কা ছিল কুমুদের মনে। ঘাটে এসে স্টীমার যেই ভিড়তো, জাহাজের তীব্র সিটি আর পাড়ের সঙ্গে ধাক্কা লেগে বড় ঢেউয়ের দোলা, কুমুদ ঘাটের কাছ থেকে ঐ সময়টায় একটু পিছিয়ে যেত। দূর থেকে ভয়ে ভয়ে স্টীমারটাকে লক্ষ্য করত।

ধীরে ধীরে তার ভয় ভাঙলো। ঘাটে গিয়ে দাঁড়িয়ে স্টীমার থেকে মানুষজন, জিনিসপত্রের ওঠানামা লক্ষ্য করতো।

আরো কিছুদিন পরে কুমুদ মিষ্টির দোকানের ছেলেদের সঙ্গে জলে নেমে যেত। জাহাজ ঘাটে ভিড়লে আশপাশের চমচম রসগোল্লার দোকানগুলো থেকে ছেলেরা হাঁড়ি ভর্তি মিষ্টি নিয়ে জলে নেমে যায়। জাহাজের যাত্রীদের আর ঘাটে নেমে মিষ্টি কিনতে হয় না। একতলার রেলিংয়ে দাঁড়িয়ে দরদাম করে হাঁড়ি ভর্তি চমচম বা অন্য মিষ্টি কেনে।

বেড়াবাড়ির মিষ্টি খুব বিখ্যাত। ঢাকা-কলকাতা পর্যন্ত নাম তার। বেড়াবাড়ি স্টীমার-স্টেশনের চেয়ে অনেক বেশি নামডাক বেড়াবাড়ির চমচমের।

সেই চমচম বিক্রির ছেলেদের সঙ্গে কুমুদও জলে নেমে যায়। যাত্রীরা কৌতুক ও কৌতূহলের সঙ্গে তার গতিবিধি লক্ষ্য করে।

ইতিমধ্যে মিষ্টির দোকানে, ছেলেদের সঙ্গে থেকে আর মিষ্টির দোকানের আশেপাশে ঘুরে ঘুরে কুমুদের চমচম খাওয়া বেশ অভ্যেস হয়ে গেছে। শুধু অভ্যেস নয় চমচম সে আজকাল খুব পছন্দ করে।

একদিন মিষ্টির ঘরের বারান্দায় কুমুদকে ঘুর ঘুর করতে দেখে একজন যাত্রী পদ্মপাতায় চমচম খেতে খেতে একটা টুকরো ভেঙে কুমুদকে দেয়। কিছুক্ষণ ঠোঁট দিয়ে খুঁটিয়ে দেখে তারপর কুমুদ টুকরোটা খেয়ে নেয়।

সেই থেকে চমচমের প্রতি কুমুদের আসক্তি শুরু। এখন যে কেউ মিষ্টি খেলেই কুমুদ তার কাছে গিয়ে দাঁড়ায় একটু ছুঁড়ে দিলে খুশি হয়ে খেয়ে নেয়।

কুমুদের একটা বড় যোগ্যতা হল শূন্য থেকে মিষ্টির টুকরো লুফে নেওয়া যে কোন বিদগ্ধ গোলরক্ষক লুফে নেওয়ার যোগ্যতায় তার কাছে হার মানবে। মজা করার জন্যে অনেকে কুমুদকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে খাওয়ায়।

ইতিমধ্যে কুমুদের আরেকটা গুণ আবিষ্কৃত হল, আবিষ্কার করলেন স্টীমার যাত্রীরা। স্টীমার থেকে যদি জলের মধ্যে খাবারের টুকরো ফেলে দেওয়া হয় তবে কুমুদ সেটা সঙ্গে সঙ্গে ডুব দিয়ে তুলে আনে। শুধু তুলেই আনে তা নয়, সেই টুকরোটা ঠোঁটে উঁচু করে তুলে ধরে সবাইকে দেখায়, যেন সে বাহবা চাইছে, তারপর সেটা গিলে ফেলে।

প্রত্যেক শনিবার বিকেলে আর সোমবার সকালে মানদায়িনী স্কুলের পণ্ডিত কাব্যতীর্থ মশায় বাড়ি যাতায়াতের পথে কুমুদকে দেখে যান, তার মাথায় হাত বুলিয়ে দেন। কুমুদ পণ্ডিতমশায়কে দেখলে আত্মহারা হয়ে যায়।

শুধু তাই নয়, দু'চার সপ্তাহ পরে নিবারণবাবু আর পণ্ডিতমশায় লক্ষ্য করলেন, শনিবার বিকেলটা যেন কি করে টের পায় কুমুদ, দুপুর থেকেই কেমন চনমন করে, তারপর এক সময় বাস স্ট্যাণ্ড পার হয়ে ডিস্ট্রীক্ট্ বোর্ডের রাস্তায় গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে পণ্ডিতমশায়ের জন্যে।

পণ্ডিতমশায় অভাবী শিক্ষক, তাছাড়া হাঁটা তাঁর খুব অভ্যাস। পয়সা বাঁচানোর জন্যে বাসে না এসে সাধারণত হেঁটে আসেন।

দূর থেকে কুমুদ পণ্ডিতমশায়ের ধূসর তালি দেওয়া ছাতা দেখলেই চিনতে পারে। বাস স্ট্যাণ্ডের থেকে একটু উত্তর দিকে রাস্তাটা বাঁক নিয়েছে, একটা বহু প্রাচীন তেঁতুল গাছের নিচে। ঐ বাঁকের মুখে গাছের নিচে যেই পণ্ডিতমশায়ের ছাতাটা দেখা যায় কঁক কঁক করে গলা দিয়ে আহ্লাদী শব্দ করতে করতে কুমুদ ছুটে যায়।

পণ্ডিতমশায় অবাক হন না। ওতো আর কোনো সাধারণ হাঁস নয়। এই ধূলি মলিন পৃথিবীর কোনো পাখি নয় এ, এ হল তাঁর স্বপ্নের মন্দাকিনী কুমুদ।

॥ চার ॥

এলেম আমি কোথা থেকে

কুমুদ খায়-দায়, ঘুরে বেড়ায়।

সাদা ধবধবে, উন্নত গ্রীবা, গজেন্দ্রগমন, বুদ্ধিদীপ্ত গোল কালো চোখ সমস্ত মিলে একটা রাজসিক ব্যাপার।

নদীর ভগ্ন পাড়ে, সাময়িক চালাঘরের ছোট স্টীমার স্টেশনের অস্তিত্ব কুমুদের রূপের ছটায়, কুমুদের গৌরবে ঝলমল করতে লাগল।

প্রায় মাইল চল্লিশের উজানের ষ্টীমার স্টেশন এনায়েতপুর, সেখানকার এক যাত্রী বেড়াবাড়ি এসেছেন, টাউনে যাবেন বলে।

এনায়েতপুরের লোকেরা সচরাচর এদিকে আসে না। কারণ: তাদের এই টাউনে কোনো কাজ থাকে না, তাদের অন্য মহকুমা, অন্য জেলা।

এই যাত্রীটি এনায়েতপুরের সম্পন্ন চাষী, হানিফ মিঞা। গত বছর সামনের শহরে মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন। কুটুম বাড়িতে যাচ্ছেন এখন মেয়েকে নিয়ে যেতে। বোধহয় মেয়ের বাচ্চা-টাচ্চা হবে।

ঘাটে বসে জিরিয়ে নিচ্ছিলেন হানিফ মিঞা। এমন সময় কোথা থেকে কুমুদ তাঁকে দেখতে পেয়ে কাছে এল। আজকাল অনেক যাত্রীর সঙ্গেই সে এরকম ঘনিষ্ট ব্যবহার করে। বিভিন্ন লোকজন সম্পর্কে নিজস্ব স্পষ্ট মতামত আছে কুমুদের।

কুমুদ উপেক্ষা করে অনেক লোককেই, তাদের কাছে ঘেঁষে না। তারা কেউ যদি 'চই চই' কিংবা 'আয় আয়' করে ডাকে তাহলেও সে ভ্রূক্ষেপ করে না, তাদের কাছে না গিয়ে বরং দূরে দূরে সরে যায়।

অন্যদিকে এমন অনেক লোক আছে যারা হয়তো কুমুদকে মোটেই খেয়াল করেনি, অথচ কুমুদ তাদের গা ঘেঁষে দাঁড়ায়, পোষা বেড়ালের মত গলা ঘষে তাদের শরীরে।

আবার এরকমও আছে যেখানে কুমুদ রীতিমত অপছন্দ করে কাউকে। সে এমনিতে শান্ত, সংযত প্রকৃতির। কিন্তু কাউকে সে ঠিক কি কারণে তাড়া করে যায় বা কামড়াতে যায় বোঝা কঠিন হয়ত শেষ পর্যন্ত ঠিক কামড়ায় না সে, তবে ভয় দেখায়।

হানিফ মিঞা একটা চমচমের দোকানের সামনে বাঁশের বেঞ্চির উপরে বসে দুটো মিষ্টি খেয়ে একটা গোলাপী বিড়ি ধরিয়ে আয়েস করে চোখ বুজে টানছিলেন।

ধলেশ্বরী আর যমুনার বাঁকের উপরে বেড়াবাড়ি ষ্টীমার স্টেশন। শীত প্রায় শেষ এখন বাতাস আর তত ঠাণ্ডা নয়, ধলেশ্বরীর দিক থেকে ঈষৎ শীতল দক্ষিণের হাওয়া আসে, একটা মাদকতাময় আবেশ আছে

এই জলের গন্ধ মাখা হাওয়ায়, এখন শান্ত দিন, দুপুরের রোদ এখনো চড়া হয়ে ওঠেনি।

মিষ্টির দোকানে আড়াই সের চমচম হাঁড়িতে ভাল করে বেঁধে দিতে বলেছেন হানিফ মিঞা, কুটুম বাড়িতে হাতে করে যাবেন। ঠাণ্ডা হাওয়া আর মৃদু রোদের আমেজে একটু সময় কাটিয়ে তারপর কুটুমবাড়ি যাবেন, এমন সময় হাঁটুর কাছে কিসের একটা কোমল স্পর্শে তাঁর খেয়াল হল, একটা সাদা ধবধবে রাজহাঁস মাথা ঘষছে তার পায়ে।

হানিফ মিঞা রাজহাঁসটার দিকে ভাল করে তাকাতে সে মুখ উঁচু করে পরম মমতাময় দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে একবার নরম করে ডাকল।

হানিফ মিঞা একদৃষ্টিতে, অনেকক্ষণ ধরে হাঁসটাকে পর্যবেক্ষণ করে তারপর মিষ্টির দোকানের মালিক হরেন ঘোষকে বললেন, 'ও ঘোষমশায়, এ হাঁসটা এখানে এল কোথা থেকে? এতো কুমারগঞ্জের রায়চৌধুরীদের হাঁস।'

হানিফ মিঞার বাড়ি এনায়েতপুর। এনায়েতপুরের পাশের গ্রাম কুমারগঞ্জ, এককালের খুব বর্দ্ধিষ্ণু এলাকা। সেখানকার তালুকদার হলেন রায়চৌধুরীরা।

এনায়েতপুর খুব কাছের জায়গা নয়। প্রায় চল্লিশ মাইল নদী সাঁতরিয়ে বেড়াবাড়ি আসতে হয়েছে কুমুদকে। ব্যাপারটা খুব সোজা নয়। তাছাড়া নিজের এলাকা ছেড়ে হাঁস, পায়রা, গরু, ছাগল গৃহ-পালিত পশুপাখি খুব বেশি দূরে কখনো যায় না, সেটা তাদের স্বভাবে নেই।

হানিফ মিঞার কথাটা অবিশ্বাস্য হলেও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। মধ্যবয়সী, ভারিক্কি, গৃহস্থ মানুষ। তাঁর উল্টোপাল্টা কথা বলা স্বাভাবিক নয়।

অন্যদিকে কাছাকাছি অঞ্চলে দশ বিশ মাইলের মধ্যে কোনো বাড়িতে কেউ এরকম রাজহাঁস পুষেছে তা শোনা যায়নি। গরিব মানুষের জলা দেশ। রাজহাঁস কোনো কাজে লাগে না, এর ডিম মাংস

কোনোটাই খাওয়ার মত নয়। এ অঞ্চলে শখ করে কেউ রাজহাঁস পুষবে ভাবা যায় না।

তাছাড়া নানা জায়গার লোকজন ষ্টীমারে যাতায়াত করার পথে কুমুদকে অনবরতই দেখছে। কুমুদের মালিকরা কাছাকাছি অঞ্চলের লোক হলে নিশ্চয়ই তারা এতদিনের মধ্যে তার খবর পেয়ে খোঁজ করতে বেড়াবাড়ি ষ্টীমার স্টেশনে আসতো।

এতদিন কেউ কোথাও থেকে আসেনি। তাই কাব্যতীর্থ মশায়ের স্বপ্ন অনুযায়ী এবং কুমুদের হাবভাব দেখে নিবারণবাবু নিশ্চিত হতে চলেছিলেন এ নিশ্চয়ই মা সরস্বতীর বাহন, মন্দাকিনীর নীলজলের আসল স্বর্গীয় রাজহংস। দু'দিনের জন্যে বেড়াতে এসেছে।

তবু নিবারণবাবুর মনে একটা খট্‌কা ছিলো ও হঠাৎ এত জায়গা থাকতে এখানে এল কেন? আর যদি মা সরস্বতীরই বাহন হবে তবে কুমুদের গলা এত কর্কশ কেন?

একটু আগে বিরাজগঞ্জ ঘাটের ফিরতি ষ্টীমার ছেড়ে চলে গেছে। টিকিট বিক্রির টাকা পয়সা জাহাজ কোম্পানির ক্যাশিয়ারের হাতে হিসাব করে বুঝিয়ে দিয়ে তারপর তাকে ষ্টীমারে তুলে আরাম করে হিন্দু হোটেলের চাতালে দাঁড়িয়ে হুঁকো টানছিলেন নিবারণবাবু।

হিন্দু হোটেলের তেওয়ারি ঠাকুর ব্রাহ্মণের জন্যে আলাদা হুঁকো রেখেছে। নিবারণবাবুর তামাক খাওয়ার খুব নেশা নেই, কিন্তু মাঝেমধ্যে ধূমপান করতে ভাল লাগে। নিজে হুঁকো রাখেননি, তেওয়ারির হোটেল থেকে হুঁকো চেয়ে নেন। জ্ঞানদাদি চমৎকার তামাক সাজে। নিবারণবাবু যে তার হোটেলের হুঁকোয় তামাক খান এতে তেওয়ারি বেশ খুশিই হয়, হাজার হোক জাহাজ কোম্পানির লোক, জাহাজ কোম্পানির মেয়াদী জমিতেই তার এই রমরমা ভাতের ব্যবসা, কোম্পানির লোককে হাতে রাখা, খুশি রাখা ভাল।

হিন্দু হোটেলের সামনে সনাতন তাঁকে জানালো যে, এনায়েতপুর থেকে এক গৃহস্থ এসেছে, মিষ্টির দোকানের বেঞ্চিতে বসে আছে, সে

বলছে যে হাঁসটা তাদের ওখান থেকে পালিয়ে এসেছে।

কুমুদ এই পৃথিবীরই হাঁস। এই নদীরই অন্য কোনো তীরের কোনো গ্রামের একথা ভাবতে নিবারণবাবুর খটকা লাগে। তিনি হুঁকোটা রেখে হানিফ মিঞার কাছে গেলেন।

তখন বাঁশের বেঞ্চির উপর উঠে হানিফ মিঞার কাঁধের উপর আল-গোছে ঠোঁট রেখে আয়েসে চোখ বুজে আহ্লাদে গরগর করছে কুমুদ।

হানিফ মিঞা নিবারণবাবুকে দেখে উঠে দাঁড়ালেন, বললেন, 'আসুন মাস্টারবাবু খুব ভাল জাতের হাঁস এটা। রায়চৌধুরী সাহেবরা রেঙ্গুন না কোথায় মগের দেশ থেকে আনিয়েছিল।'

নিবারণবাবু একটু নিশ্চিন্ত হলেন, মগের দেশ মানে এসব দেশ নয়, স্বর্গের কাছাকাছি কোনো জায়গা হবে, হয়তো মন্দাকিনী নদীর তীরেই। তবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'এটা তবে কুমারগঞ্জের রায়চৌধুরী সাহেবদের হাঁস?'

হানিফ মিঞা বললেন, 'আরো অনেক ছিল। সে বাড়ির বড় গিন্নি খুব ভালবাসত এদের, এদের পায়ে ঝুমুর বেঁধে দিয়েছিল। এখনো দেখুন পায়ে একটু দাগ আছে ঝুমুরের।'

তারপর একটু থেমে বললেন, 'আমাকে দেখে চিনতে পেরেছে। রায়চৌধুরীদের বড় দীঘিতে ছিপ দিয়ে মাছ ধরতাম মেজো কর্তার সঙ্গে। আমাদের পায়ে পায়ে ঘুরত।

নিবারণবাবু প্রশ্ন করলেন, 'ওখান থেকে চলে এলো কেন?'

হানিফ মিঞা বললেন, 'বড় গিন্নি মারা গেলেন। কর্তারা আর কর্তাদের ছেলেপিলেরা ঢাকা-কলকাতায় ছড়িয়ে গেছে। বছরে একবার পর্যন্ত বাড়ি আসে না। এরা রাজাপাখি, খালি বাড়িতে থাকতে পারে না। সব সময় লোকজন হইচই পছন্দ করে। সব চারদিকে কোথায় কোথায় চলে গেল। যে দু'একটা শেষ পর্যন্ত ছিল সেগুলোও ভেসে গেল গত সনের বন্যায়। এনায়েতপুরের মাঠঘাট, কুমারগঞ্জের বাড়ি-ঘর, রায়চৌধুরীদের পুকুর দালান, স্টীমার ঘাট, মায় নদী সব একাকার হয়ে গেল। হাঁসগুলো ছড়িয়ে পড়ল চারধারে।'

কুমুদের মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে হানিফ মিঞা বলল, 'ও ভাসতে ভাসতে চলে এল আপনার এখানে। এখানে তো ভালই আছে দেখছি।'

ভাল যে আছে সেটা প্রমাণ করার জন্যে মাথা উঁচু করে কয়েকবার ডানা ঝেড়ে কুমুদ খুশির সঙ্গে দু'বার কঁক কঁক করে ডেকে উঠল।

আরেকবার রাজহাঁসের পালকে হাত বুলিয়ে হানিফ মিঞা চলে গেলেন, যাওয়ার সময় নিবারণবাবুকে বলে গেলেন, 'দেখতে পাবেন মাস্টারমশায়, খুব বুদ্ধিমান পাখি।'

॥ পাঁচ ॥

ভ্রমণকাহিনী

বাস স্ট্যাণ্ডের ওদিক থেকে পণ্ডিতমশায়কে অভ্যর্থনা জানিয়ে তাঁকে নিয়ে আসে কুমুদ সরাসরি নিবারণবাবুর ঘরে।

প্রত্যেক শনিবারই এমন হয়। আজো তাই হল। কিন্তু আজ যখন নিবারণবাবুর সঙ্গে সামান্য কিছু কথাবার্তা বলে পণ্ডিতমশায় বাড়ি যাওয়ার স্টীমারে উঠলেন, তাঁর পিছু পিছু কুমুদও পাটাতনের সিঁড়ি বেয়ে স্টীমারে গিয়ে চড়লো।

আজ কয়েকদিন হল কুমুদের এই ব্যাপারটা দেখা যাচ্ছে। জাহাজের অনেক খালাসীর সঙ্গেই তার বেশ ভাব। দু'একজন সারেংও তাকে ভালবাসে, পছন্দ করে।

এখন ঘাটে জাহাজ লাগলে সে আর খুব একটা ঘুরে ঘুরে ডুব দিয়ে যাত্রীদের ছুঁড়ে দেওয়া খাবার জলের থেকে তুলে নিয়ে খায় না। সোজা সিঁড়ি বেয়ে উঠে যায়। তারপর স্টীমারের চারপাশটা ঘুরে ঘুরে দেখে। ইঞ্জিন ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে বিশেষ কৌতূহল নিয়ে যন্ত্রের দপদপ শব্দ কান পেতে শোনে। কখনো দেড়তলায় উঠে যায়, সারেং সাহেবের ঘরে ঢুকে সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে।

ফাল্গুন মাসের একেক দিন বিয়ের লগ্ন থাকে। গ্রাম গ্রামান্তর থেকে

জোড়ায় জোড়ায় নতুন বিয়ে হওয়া বর বৌ ওঠে স্টীমারে, নতুন বৌ লাল শাঁখা, লাল চেলি পরে শ্বশুর বাড়ি যায়, মুখে ঘোমটা টেনে।

কুমুদের নতুন বৌ খুব পছন্দ। কোনো স্টীমারে নতুন দম্পতি থাকলে সে সোজা সেখানে গিয়ে নতুন বৌয়ের চারপাশে ঘুরে ঘুরে দেখে। বরযাত্রীরা তার কাণ্ড আর হাবভাব দেখে হেসে জিজ্ঞাসা করে, 'কি রাজামশায়, নতুন বৌ পছন্দ হয়েছে তো?' অথবা, 'কুমুদবাবু, এবার আপনিও একটা বিয়ে করুন লাল টুকটুকে বৌ দেখে। আমাদের গাঁয়ের বিলে চমৎকার বুনোহাঁস আছে একবার গিয়ে দেখে আসুন না।'

মাঝে মাঝে দু'চারটে গোলমেলে লোকও থাকে, বিশেষ করে বাচ্চাকাচ্চা হলে তো কথাই নেই। অনেকে পিছন থেকে জাপটিয়ে ধরতে চায় কুমুদকে, কিংবা হয়তো গলাটা খপ্ করে চেপে ধরবে।

কিন্তু কুমুদ সতর্ক। মোক্ষম মুহূর্তে সে যেন কি করে টের পায়। সাবলীলভাবে নিজেকে এড়িয়ে নিয়ে যায়।

তাছাড়া চলাফেরার মধ্যে রীতিমত একটা রাশভারী ভাব রয়েছে, অনেকেই তাকে ভয় পায়, রীতিমত সমীহ করে। বিশেষ কেউ ঘাঁটাতে চায় না। তবে সবাই খুব অবাক হয়ে দেখে একটা সাদা রাজহাঁস, এত বড়ো একটা পাখি যাত্রীদের বাক্স বিছানা, ঘটিবাটির মধ্য দিয়ে চলাফেরা করছে, সিঁড়ি দিয়ে তরতর করে নামাওঠা করছে।

সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হল জাহাজের ভোঁ বেজে ওঠার সময়। যেই ভোঁ বাজলো সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে, খালাসীরা পাটাতনের সিঁড়ি তুলে ফেলার আগেই কুমুদ নেমে আসে স্টীমার থেকে। অনেক সময় এ সময়টা খুব ভিড় হয় নদীর ঘাটে ইতস্তত ছড়িয়ে থাকে যে সব যাত্রীরা তারা সবাই হুড়োহুড়ি করে ছুটে আসে জাহাজে উঠবার জন্যে, ভোঁ বেজেছে, এখনই ছাড়বে। অনেকে বেশ অস্থির হয়ে ওঠে।

ভিড়টা আসে উল্টো দিক থেকে। কুমুদ নামবে আর লোকজন উঠবে। কুমুদ ধৈর্য ধরে পাটাতনের একপাশে দাঁড়িয়ে থাকে, যেইমাত্র উপরে উঠবার ভিড়টা একটু পাতলা হয়ে আসে, সে টুক করে নেমে যায়। ঘাটে নেমে সোজা নিবারণবাবুর কাছে। নিবারণবাবু হাতের

কাজ সারতে সারতে কুমুদকে জিজ্ঞাসা করেন, 'কি কুমুদ? তা হলে জাহাজ এবার ছাড়বে? সব ঠিক আছে তো?'

কুমুদ কোনো জবাব দেয় না। বেঞ্চির উপর উঠে নিজের পালকে মাথা গুঁজে চোখ বুজে থাকে। যেন অনেক পরিশ্রম করে এসেছে, এখন বিশ্রাম দরকার।

আজ শনিবার বিকেলে কাব্যতীর্থ মশায়ের সঙ্গে কুমুদ গিয়ে জাহাজে চড়ল।

শ্রীযুক্ত জয়গোপাল কাব্যতীর্থের বাড়ি বেড়াবাড়ি ঘাট থেকে তিরিশ মাইল উত্তরে—সেখানে নয়নার ঘাটে নেমে হেঁটে আরো তিন ক্রোশ গেলে তবে তাঁর গ্রাম আমোদপুর। সেখানে এক মাঝারি আয়তনের একান্নবর্তী পরিবারের তিনি কর্তা এবং একমাত্র উপার্জনশীল পুরুষ।

বিধবা মা, বিধবা দিদি এবং এক বিধবা কন্যা তাঁর বাড়িতে। সংসারের চতুর্থ মহিলা তাঁর স্ত্রী একমাত্র সধবা। এ ছাড়া এক ভাগ্নে এবং তিনটি অপোগণ্ড পুত্রসন্তান নিয়ে তাঁর সংসার।

চাকরির সামান্য আয়, বিঘে আড়াই ধানজমি আর কয়েক ঘর নিম্নমধ্যবিত্ত যজমান, কোনো রকমে তাঁর সম্বৎসর কেটে যায়।

জিনিসপত্র দুর্মূল্য হচ্ছে। ইস্কুলে মাস্টার মশাইরা কলকাতা থেকে আসা তিনদিনের বাসী খবরের কাগজ পড়ে আলোচনা করেন যুদ্ধ ঘরের কাছে এসে যাচ্ছে। চালের দর পাঁচ টাকায় উঠেছে, একটা মিলের মোটা শাড়ি আড়াই টাকা তিনটাকা দাম।

তবে খুব একটা বেকায়দায় না পড়লে কাব্যতীর্থ মশায় এসব কিছু নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কষ্ট পেতে চান না। তাঁর চিন্তা এখন অন্যত্র। একটি স্বর্গীয় হংসের মর্ত্যে আগমনের উপরে মন্দাক্রান্তা ছন্দে তিনি একটি দীর্ঘ পদ্য রচনায় হাত দিয়েছেন। তাতেই তাঁর হৃদয়-মন নিমজ্জিত।

স্টীমারে ওঠার মুখে একটু ভিড় ধাক্কাধাক্কি ছিল। ধুতির খুঁটে এ মাসের মাইনের টাকা কোমরে জড়িয়ে বাঁধা আছে। তবে যা দিনকাল পড়েছে, শুধু হাট-বাজারেই নয়, আজকাল জাহাজেও গাঁটকাটা উঠছে।

কাব্যতীর্থ মশায় একটু সাবধান হতে গিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে

গিয়েছিলেন। কোনোরকমে গাঁট বাঁচিয়ে জাহাজের ওপাশে একটা হেলান দেওয়া বেঞ্চি আছে ডেকের ধারে সেখানে গিয়ে পৌঁছলেন তিনি। তারপর এক কোণায় বসে খেয়াল করলেন তাঁর সঙ্গে সঙ্গে কুমুদও উঠে এসেছে, পায়ের কাছে বসে আছে।

পণ্ডিতমাশয় ভাবলেন যে স্টীমার ছাড়ার সময়ে কুমুদ নেমে যাবে, এখন আহ্লাদ করে আমার সঙ্গে এসেছে, থাকুক, একটু বসে থাকুক।

কিন্তু অন্যদিন জাহাজের ভোঁ বাজলে কুমুদ যেমন চঞ্চল হয়ে ওঠে, সঙ্গে সঙ্গে তড়িৎগতিতে ঘাটে নেমে যায়, আজ কিন্তু তা করল না। আরও একটু ঘনিষ্ঠ হয়ে পণ্ডিত মশায়েব পা ঘেঁষে এল।

পণ্ডিতমশায় একটু বিচলিত বোধ করলেন, কুমুদের মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, 'ও কুমুদ, লক্ষ্মীটি বাবা, জাহাজ যে ছেড়ে দিচ্ছে, নেমে যাও তাড়াতাড়ি।' কিন্তু কুমুদের নড়াচড়ার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না।

জাহাজ ছেড়ে দিচ্ছে। সিঁড়ি তোলার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। আরেক-বার ভোঁ বাজল। পণ্ডিতমশায় সারেং সাহেবের ঘরে ছুটে গেলেন, 'ও সারেন সাহেব, জাহাজ ছাড়বেন না, রাজহাঁসটা যে নামে নি এখনো।'

সারেং ভদ্রলোক কড়া মানুষ, চট্টগ্রামেব কৈবর্ত মাঝি, কোনোদিন কোনো বিশেষ যাত্রীর জন্যও তিনি নিয়মের অতিবিক্ত একমিনিট অপেক্ষা করেন না, আজকেও তাই হল।

শেষ মুহূর্তে নিরুপায় পণ্ডিতমশায় জাহাজের বেলিঙের ধারে ছুটে গিয়ে নিবারণবাবুকে চেঁচিয়ে ডাকতে লাগলেন। কিন্তু ততক্ষণে জাহাজ ছেড়ে দিয়েছে ইঞ্জিনের শব্দ, লোকজনের খালাসীদের চেঁচামেচি অতিক্রম করে ধলেশ্বরীর বিকেলের শন্‌শন্‌ হাওয়া পণ্ডিতমশায়ের চিৎকার ঘাটে পৌঁছে দিতে পারল না।

পণ্ডিতমশায় চিন্তিত মুখে বেঞ্চিতে এসে বসলেন। তখন কুমুদ চোখ বুজে ঘুমুচ্ছে তাঁর সীটের পাশে। পণ্ডিতমশায় কিন্তু অস্থির হয়ে উঠলেন, কি করা যায়। কুমুদকে যদি নদীর জলে ছুঁড়ে দেওয়া যায় তাহলে ও নিশ্চয় সাঁতরিয়ে ঘাটে পৌঁছতে পারবে। কিন্তু যদি ষ্টীমারের চাকার নিচে চলে যায়। তাহলে তো নির্ঘাৎ অপমৃত্যু।

পণ্ডিতমশায়ের অস্থিরতা দেখে একজন খালাসী তাঁর কাছে এগিয়ে এল এবং বলল যে, 'পণ্ডিতমশায়, হাঁস নিয়ে ভাববেন না। জাহাজ তো রাত্রে আবার বেড়াবাড়ি ঘাটে ফিরবে তখন হাঁসটা নামিয়ে দেবো। এখন থাকুক না যেমন আছে।'

এত সহজ সমাধানটা পণ্ডিতমশায়ের মাথায় আসেনি। তিনি খালাসীকে ধন্যবাদ দিতে গিয়ে খেয়াল করলেন তাঁরই এক পুরনো ছাত্র, নামটা মনে পড়ছে না, কিন্তু খুব অগা ছেলে ছিল, কোনদিন সংস্কৃতে পনেরর বেশি পায়নি। এইট-নাইন পর্যন্ত পড়েছিল, কিন্তু এখন তো দেখছেন বেশ বুদ্ধিমান হয়েছে। ধন্যবাদ না জানিয়ে প্রাক্তন ছাত্রটিকে জয়গোপাল কাব্যতীর্থ আশীর্বাদ করলেন এবং বললেন, 'বাবা, তুমি ফেরার সময় ওকে মনে করে নামিয়ে দিও বেড়াবাড়ি ঘাটে।'

পুরনো ছাত্রটি, তার নাম জানা গেল বলাই, সে পণ্ডিতমশায়কে আশ্বস্ত করল। 'আপনি ভাববেন না স্যার, আমি ঠিক বেড়াবাড়ি ঘাটে নামিয়ে দেব।'

বলাইয়ের দায়িত্বে কুমুদকে রেখে নয়নার ঘাটে জাহাজ পৌঁছতে পণ্ডিতমশায় নামতে গেলেন, কিন্তু অসুবিধে দাঁড়াল যে কুমুদ তাঁর পিছু নিল। বলাই ছুটে গিয়ে কুমুদকে বাধা দিতে কুমুদ হিংস্রভাবে ধারালো ঠোঁট দিয়ে তাকে তাড়া করল যেভাবে প্রথমদিন বেড়াবাড়ির ঘাটে দাশু কুকুরটাকে আক্রমণ করেছিল।

তাতেও যখন বলাই ভয় পেল না, কুমুদ হঠাৎ জাহাজের রেলিঙের উপর দিয়ে পাখা মেলে হাওয়ায় ঝাঁপ দিল। পণ্ডিতমশায় সে দৃশ্য দেখে সেই প্রসারিত সাদা ডানা উর্ধ্বে উঠে যেতে দেখে ভাবলেন, স্বর্গের হাঁস কুমুদ এবার মন্দাকিনীতে ফিরে যাচ্ছে।

কুমুদ কিন্তু আকাশে উড়ল না। সেই নয়নার ঘাটে গিয়ে একটা দোকানের সামনে পড়ল। বোধহয় ওড়া অভ্যেস নেই, মাটিতে পড়ে প্রায় মাথা উলটিয়ে যাচ্ছিল, একটা ধাক্কা খেয়ে সামলিয়ে নিল।'

ততক্ষণে পণ্ডিতমশায় ঘাটে নেমে এসেছেন। কুমুদও তাঁর কাছে এসে দাঁড়াল। চারপাশের কৌতূহলী জনতার রাজহাঁস সম্পর্কে নানা

প্রশ্নের দু'চারটে সংক্ষিপ্ত জবাব হুঁ-হুঁ করতে করতে পণ্ডিতমশায় মন-স্থির করলেন।

এখনো সন্ধ্যা হতে বাকি আছে। এদিকটায় শেয়ালের খুব উৎপাত, এখন কুমুদ তাঁর সঙ্গে বাসায় চলুক। মনে হচ্ছে কুমুদ তাঁর পিছে পিছে হাঁটছে। বাসায় গিয়ে রাতে ভাঁড়ার ঘরটা কুলুপ এঁটে ওকে আটকিয়ে রাখতে হবে, নাহলে শেয়ালের হাতে মারা পড়বে। পথেও ভয় আছে, তবে দিনের বেলায় শেয়াল বেরবে না। তাড়াতাড়ি যেতে হবে।

সত্যি সত্যি কুমুদ পণ্ডিতমশায়ের সঙ্গে সঙ্গে হাঁটতে লাগল। ফাল্গুনের অপরাহ্নের হলুদ রোদে নয়না ঘাটের ভাঙা রাস্তায় এক প্রৌঢ় গ্রাম্য কবি আর এক অমল রাজহাঁস চমৎকার পাশাপাশি যেতে লাগল।

সন্ধ্যার একটু আগে গ্রামে পৌঁছলেন পণ্ডিতমশায়। প্রতিদিন এই সময়ে তাঁর স্ত্রী ও জননীর কলহ লাগে, আজও যথারীতি তাই শুরু হয়েছে নিশ্চয়, ভাবতে ভাবতে পণ্ডিতমশায় বাড়ির দিকে এগোলেন। সঙ্গে পায়ে পায়ে কুমুদ।

কিন্তু গ্রামের মধ্যে কেমন একটা চাপা ভাব। সবার মুখ কেমন থমথমে মনে হল পণ্ডিতমশায়ের।

বাড়ির ভিতরে না ঢোকা পর্যন্ত দুঃসংবাদটা তাঁর সম্যক উপলব্ধি হয়নি। তাঁর বিধবা মেয়েটি আজ বিকেলেই ঢেঁকি ঘরে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। পণ্ডিতমশায়ের পরম আদরের প্রথম সন্তান সে, শুধু বাবাকে মৃতমুখ দেখানোর জন্যই শনিবার বিকেল পর্যন্ত বোধহয় অপেক্ষা করেছিল। পণ্ডিতমশায় মাথা ঘুরে পড়ে গেলেন।

সেদিন রাতে সবাই যখন শ্মশান থেকে ফিরে এসেছে তার একটু আগে পণ্ডিতমশায়ের জ্ঞান হয়েছে। মেয়ে বিধবা হয়েছিল, কিন্তু মা-বাবা-ঠাকুমার ভালবাসার অভাব ছিল না। এত কি দুঃখ, কি অভিমান তার হয়েছিল! জয়গোপাল মেয়ের কথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ কুমুদের কথা মনে পড়ল।

আজ আকাশে এক বড় চাঁদ উঠেছে। দূরে কোথায় কোকিল ডাকছে, আমের মুকুলের গন্ধে বাড়িঘর ছেয়ে গেছে। এইরকম সব অপার্থিব নিশীথে পৃথিবীর জলকাদা ডানায় ঝেড়ে ফেলে শুভ্র মরালেরা আকাশের নীলিমা অতিক্রম করে মন্দাকিনীর দিকে উড়ে যায়।

কাব্যতীর্থ মশায় বারান্দায় শুয়ে ছিলেন উঠে বসে দাওয়ায় ঠেস দিয়ে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগলেন, কুমুদ, কুমুদ কোথায় গেল ?

॥ ছয় ॥

কুমুদিনী

ঐ শনিবার রাতেই কুমুদ নয়নার ঘাটে ফিরে এসে সেখান থেকে ফিরতি স্টীমারে চড়ে বেড়াবাড়িতে এসে নামে। বলাই খালাসী নয়নার ঘাটে দেখতে পায় হাঁসটা ছাড়ার ঠিক আগের মুহূর্তে ছুটতে ছুটতে এসে জাহাজে উঠল। বেড়াবাড়িতে সে একাই নেমে যায়, বলাইকে কিছুই করতে হয়নি।

পণ্ডিতমশায় মেয়ের মৃত্যুর পর দু'সপ্তাহ বিদ্যালয়ে যাননি। পনের দিন পরের এক সোমবারে যখন স্টীমারে চড়ে বেড়াবেড়ির ঘাটে এলেন, তিনি অবাক। ঘাটের সিঁড়ির উপরে কুমুদ দাঁড়িয়ে রয়েছে, তাঁকে দেখে কুমুদ উচ্ছ্বসিত উত্তেজিত হয়ে উঠল। তাড়াতাড়ি ঘাটে নেমে এসে তিনি কুমুদের গায়ে মাথায় হাত বুলোলেন।

এই ক'য়দিনে শোকটা তিনি একটু সামলে নিয়েছেন। কুমুদকে নিয়ে প্রতিদিনই চিন্তা করেছেন, শেয়ালে মেরে ফেলল না স্বর্গে উড়ে গেল, এই দুই অতি বিপরীত প্রশ্নের তাঁর কাছে কোনো সমাধান মেলেনি।

আজ সকালে স্টীমারে বলাই খালাসী যখন তাঁকে বলল যে সেইদিন রাতেই কুমুদ ফিরে গিয়েছিল, তিনি আশ্বস্ত বোধ করেছিলেন।

কিন্তু বলাইয়ের আরেকটা কথা শুনে তিনি বিস্মিত ও চিন্তিত হয়েছিলেন, আজকাল নাকি একা একাই জাহাজে চড়ে এদিক-ওদিকে, এ

ঘাট সেঘাটে নামে, তারপর সময়মত ঠিক উল্টো জাহাজে চড়ে বেড়াবাড়ি ফিরে আসে। এর মধ্যে তিন-চারদিন নাকি সে নয়নার ঘাটেও ঘুরে গেছে।

ঘাটে নেমে পণ্ডিতমশায়ের নিবারণবাবুর সঙ্গে দেখা হল। ইতিমধ্যে নিবারণবাবু লোক মুখে পণ্ডিত মশায়ের মেয়ের ঘটনা শুনেছেন, তিনি আরো শুনেছেন মেয়েটির নাকি চরিত্রদোষ ছিল। পণ্ডিতমশায় আলাভোলা মানুষ, কিছুই খবর রাখতেন না। পণ্ডিত মশায়ের সঙ্গে এ সব বিষয় আলোচনা করে তাঁর দুঃখ বাড়িয়ে লাভ নেই, নিবারণবাবু বুদ্ধিমান লোক। তিনি এ সব কথা উত্থাপন করলেন না পণ্ডিতমশায়ের কাছে। বরং ঘাটে দাঁড়িয়ে দু-চার মিনিট যা কথা হল তা কুমুদেব এই যাতায়াত নিয়ে, কুমুদের ভ্রমণ প্রীতি বিষয়ে।

নিবারণবাবু পণ্ডিতমশায়কে বললেন, 'পণ্ডিত মশায়, আপনার কুমুদ এখন আর বেড়াবাড়ির কুমুদ নয়, সে ধলেশ্বরীর কুমুদ, সে ঘাটের কুমুদ থেকে জাহাজের কুমুদ হয়েছে।'

পণ্ডিতমশায় স্কুলে চলে গেলেন। কুমুদ তার পিছে পিছে হেঁটে রাস্তায় তাঁকে তেঁতুলগাছটা পর্যন্ত পৌছিয়ে দিয়ে এল। তারপর এসে কিছুক্ষণ এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করল। হিন্দু হোটেলের কাঠ রাখবাব জায়গায় বারান্দার এক কোণে রাখা কুকুরটার আজ কিছুদিন হল তিনটে বাচ্চা হয়েছে। তাদের সদ্য চোখ ফুটেছে। তাদের সম্পর্কে অদম্য কৌতূহল কুমুদেব। মাঝে মাঝেই উঁকি দিয়ে দেখতে যায়। বিলুর এ ব্যাপাবে ঘোরতর আপত্তি সে কুমুদের এই উৎসাহ অতিরিক্ত সন্দেহেব চোখে দেখে। কুমুদকে ওদিক পানে দেখলেই সে দাঁত খিঁচিয়ে আসে। কুমুদ এসব কিছু মনে করে না এখন, বিশেষ গ্রাহ্যও কবে না। দাশুরাশু এবং আর সকলের সঙ্গে সে মানিয়ে নিয়েছে।

কুকুরের বাচ্চা পর্যবেক্ষণ শেষ কবে ধীরে-সুস্থে কুমুদ এনায়েতপুরের স্টীমারে এসে উঠল। স্টীমারটা আধ ঘণ্টা আগে ভিড়েছে, এবার ফিরবে। নানা জায়গার মধ্যে কুমুদ আজকাল মধ্যে মধ্যে এনায়েতপুরেও যায়।

তবে এনায়েতপুরে নেমে সে ঘাটের আশেপাশেই থাকে, তা নয়।

তাকে অনেকে কুমারগঞ্জের দিকে যেতে দেখেছে। দিনের বেলা হলে সে হাঁটা পথেই কুমারগঞ্জে যায়, সে রাস্তাটা অল্প। কিন্তু সন্ধ্যা হলে সে আল দিয়ে যায়, এতে একটু ঘোরা হয়। শেয়ালের থেকে আত্মরক্ষার জন্যই সে এটা করে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

বেশ বোঝা যায় এনায়েতপুর-কুমারগঞ্জের পথঘাট সবই বেশ চেনা কুমুদের। নিবারণবাবু খোঁজ নিয়েছেন, শুধু হানিফ মিঞাই নয়, ও অঞ্চলের অনেকেই কুমুদকে ভাল চেনে। তারা বলেছে, কুমারগঞ্জের রায়চৌধুরীদের হাঁস, বুনো হয়ে গেছে।

রায়চৌধুরীদের দীঘিতেও দু-একবার গিয়ে ঘুরে এসেছে কুমুদ। সে পুকুরে এখনো তার স্বজাতি দু-চারজন আছে। কিন্তু এই পর্যন্তই, পাকাপাকিভাবে সে কোথাও থাকে না। খুব ঝড় বাদলা বিপর্যয়ে স্টীমার চলাচল ব্যাহত না হলে, যেদিক থেকেই হোক শেষ ট্রিপে কুমুদ বেড়াবাড়ি ঘাটে ফিরে আসে। একবার সারা ঘাট পরিদর্শন করে, মিষ্টির দোকানঘর থেকে কিছু খাবার খেয়ে নিবারণবাবুর ঘরে চলে আসে।

মিষ্টির দোকানে রাতের দিকে হাতে গড়া রুটি বিক্রি হয়। আজকাল কুমুদ রুটি খেতে শিখেছে। লোকেরা মজা করার জন্য তাকে রুটি ছুঁড়ে দেয়, সে শূন্য থেকে ঠোঁট দিয়ে লুফে নিয়ে দু'পায়ের পাতার মধ্যে ধরে ঠোঁট দিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায়। তবে এখনো তার সবচেয়ে প্রিয় খাবার হলো মুড়ি, সকালবেলায় নিবারণবাবুর সঙ্গে ব্রেকফাস্ট।

সে যা হোক, একদিন এনায়েতপুরের জাহাজ আসতে অনেক রাত হল। বৈশাখ মাস সেটা, নদী শুকিয়ে এসেছে। মধ্যে মধ্যে চরা পড়ছে, ডুবো চরা, জলের একটু নিচেই। তাতে এই খরার সময়ে কখনো কখনো স্টীমার আটকিয়ে যায়। সে এক ঝামেলা। বেশ সময় লাগে মাটি কেটে বেরিয়ে আসতে।

সেদিন যে জায়গাটায় স্টীমারটা আটকে গিয়েছিল, বেড়াবাড়ি থেকে দূরে নয়। মাত্র কয়েক মাইল।

স্টীমারটা আটকে যাওয়ার পর কুমুদ কি বুঝল কে জানে, সে তরতর

করে নদীতে নেমে পড়ল। তারপর বেড়াবাড়ির দিকে রওনা হল। জাহাজের অনেকেই সে দৃশ্য দেখেছে।

দেখেছে পারের শেয়ালেরাও। তারা অনেকদিন ধরে রাজহাঁসটার ওপর নজর রাখছে। আজ তারা পাড় ধরে ধরে হাঁসের সঙ্গে বেড়াবাড়ি ঘাটের দিকে এগোতে লাগল। এক সঙ্গে প্রায় পাঁচ-সাতটা শেয়াল।

রাত তখন প্রায় সাড়ে দশটা। ঘাট অন্ধকার। মিষ্টির দোকানের হ্যাজাকগুলো নিবিয়ে দোকানটায় লণ্ঠন জ্বালিয়েছে। শুধু একটা ডে-লাইট নিবারণবাবুর অফিসের বারান্দায় জ্বলছে, তারও তেজ কমে এসেছে।

রাশুর তিনটে বাচ্চার মধ্যে একটা বাচ্চা ছোটবেলায় শেয়ালে চুরি করে খেয়েছে। বাকি দুটো এর মধ্যেই বেশ বড় হয়েছে। কিছুক্ষণ হল সেই বাচ্চা দুটো ঘাটের একটু পেছন দিকে প্রচণ্ড ঘেউ ঘেউ শুরু করেছে। ইতিমধ্যে দেখা গেল দাশু-রাশুও গর্জন করতে করতে সেই দিকে ছুটে গেল। জলের ধারে চারটে কুকুরের এই চেঁচামেচি নিবারণ-বাবুর কেমন যেন মনে হল এবং তিনি সেই মুহূর্তে একটা তীব্র কর্কশ চিৎকার এবং স্পষ্ট ডানার ঝাপটানি শুনতে পেলেন। তাঁর হাতের কাছে কোম্পানির দেওয়া একটা বড় পাঁচ সেলের টর্চলাইট থাকে, সেটা নিয়ে তিনি তাড়াতাড়ি ঘাটের দিকে এগোলেন। কুকুরদের ডাকাডাকি শুনে জ্ঞানদাদি পাশের ঘাটে বাসন মাজছিল, সেও দৌড়ে এল লণ্ঠন হাতে।

পাঁচ সেলের টর্চের তীব্র আলোয় স্পষ্ট দেখতে পেলেন নিবারণবাবু কুমুদকে ঘাটের কাছে পাঁচ-ছটা বড় বড় শেয়াল ঘিরে রয়েছে। চেঁচা-মেচি করছে বটে কিন্তু খাড়া পাড় থেকে তার কুড়ি ফুট নিচে লাফিয়ে নামতে পারবে না, ধূর্ত শেয়ালেরা সেটা বুঝতে পেরেছে।

নিবারণবাবুর টর্চের আলো পড়তেই শেয়ালগুলো একটু হকচকিয়ে পিছিয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে কুমুদ সবচেয়ে সামনে যে শেয়ালটা ছিল তার মাথায় বিদ্যুৎ গতিতে একটা তীক্ষ্ণ ঠোকর দিল, তারপর আর একটা, তারপর আরেকটা। ততক্ষণে জ্ঞানদাদি লণ্ঠন নিয়ে অকুস্থলে পৌঁছে

গেছেন। আহত শেয়ালটা করুণ আর্তনাদ করে সরে যেতেই কুমুদ তরতর করে জল থেকে উঠে জ্ঞানদাদির লণ্ঠনের সামনে চলে এল। তখনো একটা লোভী শেয়াল তার পিছে পিছে এগোচ্ছিল, কুমুদ ক্ষিপ্র ফুটবল খেলোয়াড়ের মতো সহসা ঘুরে গিয়ে তাকে তাড়া করে গেল।

এদিকে ঘাটের পিছন দিক দিয়ে ঘুরে দাশু-রাসু এবং বাচ্চা দুটো এবার জ্ঞানদাদির কাছে পৌঁছে গেছে। তারা চারজনে নদীর ধার ধরে প্রায় আধ মাইল রাস্তা শেয়ালগুলোকে তাড়া দিয়ে বিদায় করে এল।

এতক্ষণে ঘাটের যত লোক সব নদীর ধারে এসে দাঁড়িয়েছে। রীতি-মত হই চই কাণ্ড, কুমুদের এই সাহস ও বীরত্বের গল্প সকলের মুখে মুখে ফিরতে লাগল।

পরের দিন স্কুলে পণ্ডিতমশায় কুমুদের এই কাহিনী ঘাটের পাশের হাজী বাড়ির একটা ছেলের কাছে শুনে বিকেলবেলা ছুটির পর উদ্বিগ্ন চিত্তে কুমুদকে দেখতে এলেন বেড়াবাড়ি ঘাটে।

অনেকদিন পরে আজ প্রথম এমন হল যে তিনি তেঁতুল গাছটার নিচে এসে কুমুদ অভ্যর্থনা জানাতে এগিয়ে আসছে এই পরিচিত ও প্রিয় দৃশ্য দেখতে পেলেন না। তাঁর আরো চিন্তা হল, তাহলে কুমুদ কি গুরুতর আহত হয়েছে?

ঘাটে এসে নিবারণবাবুর কাছে যা শুনলেন সেটা অবশ্য সুখবর। কুমুদকে শেয়ালরা কিছু করে উঠতে পারেনি, শুধু দু-একটা পালক ঝরেছে। কুমুদ ব্যাপারটাকে কোনো গুরুত্বই দেয়নি। রাতে ভাল ঘুমিয়েছে, ভোরবেলা নিবারণবাবুর সঙ্গে মুড়ি খেয়েছে, তারপর ঘাটের চাতালে নেমে রাসুর বাচ্চা দুটোর সঙ্গে খেলা করেছে।

কুকুরছানা দুটোর সঙ্গে কুমুদের খুব ভাব। এখন আর রাসু ও নিয়ে মাথা ঘামায় না কুকুরছানা দুটো বড় হয়েছে, তারা ছুটে ছুটে এসে কুমুদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, নকল মারামারি করে, আবার তারা যখন জাপটা-জাপটি করে ক্লান্ত হয়ে মড়ার মতো ঘুমিয়ে থাকে, কুমুদ দুষ্টুমি করে তাদের লেজ টেনে বিরক্ত করে।

আজ সকালেও বাচ্চা দুটোর সঙ্গে কুমুদ অনেকক্ষণ খেলেছে। তারপর বিরাজগঞ্জের জাহাজ এলে সেটায় চড়ে চলে গেছে।

পণ্ডিতমশায় ফিরে গেলেন। দুঃখের বিষয় পরের শনিবার কুমুদের সঙ্গে তাঁর দেখা হল না। কুমুদ সেদিন সন্ধ্যাবেলা ঠিকই ফিরেছিল, কিন্তু দু'দিন পরে বৃহস্পতিবার দিন থেকে আর ফেরেনি।

নিবারণবাবু চিন্তায় ছিলেন। কিন্তু এনায়েতপুর থেকে খবর এসেছে, কুমুদ কুমারগঞ্জের রায়চৌধুরীদের দীঘিতে নাকি ফিরে গেছে। সেখানেই অন্য হাঁসেদের সঙ্গে থাকছে।

রায়চৌধুরীদের দীঘিতে বড় বড় মাছ। এখান থেকে অনেক লোক ছিপ নিয়ে সেখানে মাছ ধরতে যায়। তারা কুমুদকে ভাল চেনে। তারা সেখানে কুমুদকে দেখেছে।

কুমুদকে চেনা অবশ্য এখন কঠিন নয়। নানা ঘাটে যায় তাই একটা তার দিয়ে তিনি কুমুদের পায়ের সঙ্গে তামার চাকতি লাগিয়ে দিয়েছেন, তাতে লেখা আছে।

কুমুদ
C/o. নিবারণবাবু
বেড়াবাড়ি ঘাট।

পরের সোমবার বাড়ি থেকে ফেরার পথেও পণ্ডিতমশায় কুমুদকে দেখতে পেলেন না।

কুমুদ এল ঠিক সাত দিন পরের বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায়, এনায়েতপুরের জাহাজে। শুধু নিবারণবাবু নয়, ঘাটের সবাই খুশী হল তার ফেরায়। লোকেরা তাকে আদর করে রুটি আর চমচম খাওয়াল।

পরের দিন সকালবেলা বুকিং ঘর খুলে পরিষ্কার করতে গিয়ে সনাতন দেখল যে হাঁসের ডিমের চেয়ে অনেক বড় আকারের, ধবধবে সাদার মধ্যে ঈষৎ নীলচে আভা একটা বড় ডিম ঘরের মেঝেয়।

কুমুদের ডিম এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। সনাতন তাড়াতাড়ি নিবারণবাবুকে ডেকে আনল,—

মাস্টারবাবু, দেখে যান আপনার নাতি হয়েছে।

পরের শনিবার পণ্ডিতমশায় যখন এলেন, তখন কুমুদ নেই। কিন্তু কুমুদের ডিমটা একটা বেতের ঝুড়ির মধ্যে বালির উপরে বসিয়ে রেখেছেন নিবারণবাবু, সেটা পণ্ডিতমশায়কে দেখিয়ে বললেন, সনাতন যা বলেছিল ঠিক তাই, 'এই দেখুন আপনার নাতি হয়েছে। তবে পৌত্র নয় দৌহিত্র আপনার হিসেব ভুল হয়েছিল, ও কুমুদ নয়, ও হল কুমুদিনী।'

নাতি, দৌহিত্র এসব বোধহয় নিবারণবাবুর উল্লেখ না করাই ভাল ছিল। অনেকদিন পরে পণ্ডিতমশায়ের মৃতা কন্যার কথা মনে পড়ল, তিনি ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন। তারপর পাঞ্জাবির ময়লা হাতা দিয়ে চোখের জল মুছতে মুছতে বললেন, 'ডিমটা ফুটবে?'

॥ সাত ॥

বুঁচি

বৃহস্পতিবার অনেক বেলা পর্যন্ত কুমুদ বেড়াবাড়ি ছিল, কিন্তু একবারও ডিমের কাছে ফিরে আসেনি। কিছুক্ষণ কুকুরের বাচ্চাদের সঙ্গে খেলা করেছে, তারপর এদিক-ওদিক ঘুরে এ দোকান সে দোকান করে অবশেষে নিবারণবাবুর ঘরে ঢুকে বাঁশের বেঞ্চিটার উপর বসে থেকেছে।

অন্যদিন এ সময় সে স্টীমারে চড়ে বসে, আজ তার এই মতি পরিবর্তন দেখে নিবারণবাবু খুশী হলেন, যাক মা হয়ে একটু স্থির হল মনে হচ্ছে।

কিন্তু কুমুদ স্থির হয়নি। আগবেলায় যখন নয়না ঘাটের জাহাজ এল, সে গিয়ে উঠে বসল সেটায়। সেই থেকে সে নিরুদ্দেশ। বলাই-খালাসী বলেছে সেদিন ফিরতি পথে সে আর কুমুদকে দেখেনি।

কুমুদকে দেখতে পেলেন পণ্ডিতমশায়, শনিবার বিকেলে নয়নার ঘাটে। স্পষ্ট বোঝা যায় যে সে তাঁর জন্যই অপেক্ষা করছিল। জাহাজ থামতেই সে সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল, সেই পুরনো কঁক, কঁক করতে করতে। তারপর পায়ে পায়ে হেঁটে তাঁর সঙ্গে বাড়ি ফিরল।

বাড়ি ফিরে জয়গোপাল কাব্যতীর্থ যা শুনলেন তা আরো তাজ্জব ব্যাপার। বৃহস্পতিবার বিকেলেই এই হাঁসটা তাঁর বাড়িতে এসেছে।

সোজা আটচালা শোয়ার ঘরটাতে ঢুকে তাঁর মেয়ে যে চৌকিটাতে শুত সেই চৌকির উপর উঠে চোখ বুজে ঘুমিয়েছে। একটা অচেনা এতবড় পাখি ঘরের মধ্যে, সবাই খুব দুশ্চিন্তিত, কিন্তু পণ্ডিতমশায়ের বৃদ্ধা মা বারবার বলেছেন, 'ওরে ও যে বুঁচি, বুঁচি যে ফিরে এসেছে, ওকে তোরা তাড়াসনে।

বুঁচি পণ্ডিতমশায়ের মেয়ের নাম। ঠাকুমার এই কাতর অনুরোধের পরে কেউ আর কুমুদকে ঘাঁটায়নি। সারাদিন কুমুদ এদিক-ওদিক ঘুরেছে। সন্ধ্যায় এসে বুঁচির শূন্য বিছানায় নিশ্চিন্তে বসে সাদা পালকের মধ্যে ঠোঁট গুঁজে চোখ বুজে সারারাত নিঃশব্দে ঘুমিয়েছে।

বাড়ি ফিরে এসে এই ঘটনা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন কবি জয়গোপাল। তাঁর 'কুমুদসম্ভব' কাব্য কাহিনীর প্রায় সবটাই বদলাতে হবে মনে হচ্ছে। কাল সকালে পাণ্ডুলিপিটা নিয়ে বসতে হবে। যেখানে শৌর্য, বীর্য ইত্যাদির বর্ণনা করেছেন, সেখানে কুমুদকে উদাসীন স্বর্গীয় মরাল বলে স্তুতি করেছেন, সেই সমস্ত শ্লোক পালটাতে হবে। আর তাছাড়া, সংস্কৃতে স্ত্রী লিঙ্গে পুং লিঙ্গে অনেক গোলমাল, প্রতিটি ছত্রেই অনেক সংশোধন হয়তো প্রয়োজন হবে।

তা হোক, কুমুদ অথবা কুমুদিনীকে দেখে তার মন ভরে গেল। বিশেষ করে পরদিন, সকালবেলায় যখন কুমুদিনী তাঁর কাছ ঘেঁষে দাঁড়াল, তিনি বারান্দায় ঠেস দিয়ে বসেছিলেন, কুমুদিনী তাঁর মাথায় ঠোঁট দিয়ে আলতো করে বিলি দিতে লাগল। তাঁর কেমন মনে হল এ স্পর্শ তাঁর চেনা, এ সেই ছোটবেলার বুঁচি, ঠিক এমনি করেই আঙুল বোলাত। তিনি কুমুদিনীর দিকে তাকালেন, সেই চোখ, কালো অন্ধকার, ছায়াময় ভালবাসাময় চোখ। এ কে, বুঁচি না কুমুদিনী? গরিব পণ্ডিতের দুঃখিনী বিধবা মেয়ে নাকি স্বর্গের মন্দাকিনীর রাজহংসী।

রাজহংসী নিয়ে খুব বেকায়দায় পড়লেন কাব্যতীর্থমশায়। তাঁর শ্লোকগুলো পালটাতে গেলে রাজহংসিনী লিখতে মন্দাক্রান্তায় সহজ

হয়। কিন্তু অনেকদিন আগে বঙ্কিমচন্দ্র বিষবৃক্ষে শ্যামাঙ্গিনী লিখে বড় জব্দ হয়েছিলেন, সোমপ্রকাশের সমালোচক এই ব্যবহার ক্ষমা করেননি। তখনো বঙ্কিম ঋষি হননি, ঋষি হলে হয়তো আর্ষ প্রয়োগ হতো। ভয়ে ভয়ে বঙ্কিম নিজেকে সংশোধন করেছিলেন।

জয়গোপাল কাব্যতীর্থ বঙ্কিমের অন্ধ ভক্ত। তাঁর ধারণা বঙ্কিম কিছু ভুল করেননি। তিনি কুমুদসম্ভব কাব্য আগাগোড়া রাজহংসিনীতে ভরিয়ে দিলেন, বাংলায় সংস্কৃতে দুবার লিখে দেখলেন রাজহংসিনী চমৎকার দেখায়।

যাকে নিয়ে এত সমস্যা সেই কুমুদ কিংবা কুমুদিনী, রাজহংস কিংবা রাজহংসী কিংবা রাজহংসিনী সে কিন্তু নির্বিকার। সে ভুলে গেল বেড়াবাড়ি ঘাট, ভুলে গেল এনায়েতপুর, কুমারগঞ্জ, নয়না ঘাট, ভুলে গেল তার শুভ্রনীল ডিমের কথা।

কুমুদিনী মিলে মিশে হারিয়ে গেল এক আধা গরিব আধা কবি-পণ্ডিতের সংসারে। পণ্ডিতমশায়ের বাড়ির পিছনের ছোট পানা পুকুরে সাঁতরিয়ে, জলে ডুবে মাছ ধরে সে চমৎকার কাটিয়ে দিল তার দিন।

এর মধ্যে একদা গান্ধীজী ডাক দিলেন, করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে, আর. এস. এন. কোম্পানির জাহাজ বয়কট হল। চালের দর উঠল টাকা-টাকা সেরে, রেঙ্গুন থেকে জাপানীরা সামনের দিকে এগোচ্ছে; রেঙ্গুন থেকে খবর পৌঁছে গেল বেড়াবাড়ি আর নয়নার ঘাটে।

সে গল্প আমার নয়, সে গল্প অন্যেরা লিখেছেন। যুদ্ধে, দুর্ভিক্ষে যাব না, সে আমার কাজ নয়। শুধু আর একটু বাকি আছে। সেটুকু বলেই আমার কাজ শেষ।

সেই শেষটুকু ছোট করে বলি।

কুমুদিনীর সেই ডিম। সেটা নিবারণবাবু হাজি-বাড়িতে পাঠিয়ে দিলেন, যদি তাঁদের মুরগিরা তা' দিয়ে ফোটাতে পারে। সত্যি একদিন একটা হাঁসের ছানা বেরল, রোগা টিঙটিঙে, রোমহীন লম্বা গলা ছাল ছাড়ানো চেহারা। সেটা হাজি-বাড়িতেই মুরগির ছানাদের সঙ্গে বড় হতে লাগল।

একটু বড় হতেই ছানাটা রাস্তা পাড়ি দিয়ে চলে এল বেড়াবাড়ি ঘাটে। একা একাই। তার রক্তের মধ্যে রয়েছে জল, জাহাজ আর ঘাটের টান।

নিবারণবাবু অবাক হয়ে দেখলেন, একেবারে কুমুদ। সেই ধবধবে রঙ, রাজসিক চেহারা, চালচলন সব কিছুতে অভিজাত। এখনো কুমুদের মতো বড়সড় হয়নি, আরেকটু বাড়বে।

ঘাটের যাত্রীরা, জাহাজের খালাসীরা সবাই ধরে নিল এই সেই পুরনো হাঁসটা, কোথায় গিয়েছিল আবার ফিরে এসেছে। কেউ জানে না, সেই হাঁসটা অনেকটা দূরের গ্রামে এক কবির বাড়ির অন্দরে ঢুকে গেছে।

সবাই ভুল করে। এমনকি পণ্ডিতমশায় পর্যন্ত। প্রত্যেক শনিবার বিকেলে মায়ের মতোই যখন কুমুদিনীর ছেলে পণ্ডিতমশায়কে দেখে এগিয়ে যায় তেঁতুলতলাব দিকে, তিনি চমকিয়ে ওঠেন, তাঁর বাড়ি থেকে কুমুদিনী কি চলে এল!

বাড়ি ফিরে দেখেন তাঁর কুমুদিনী, তাঁর বুঁচি ঠিকই আছে।

লেখকের অন্যান্য বই

ডোডো-তাতাই পালাকাহিনী

একটি কুকুরের উপাখ্যান

কাণ্ডজ্ঞান

বিদ্যাবুদ্ধি

নীলদিগন্তে এখন ম্যাজিক

দারিদ্র্যরেখা